হাসি কান্না চুনী পান্না

চ্যাটার্জি পাব্লিশার্স
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

Published by B. Chatterji
for Chatterji Publishers,
15, Bankim Chatterji Street,
Calcutta-12

প্রকাশ কাল—শ্রাবণ ১৩৩৩

Printed by S. Chatterji,
Chatterji Printers,
42A, Malanga Lane,
Calcutta-12

এই লেখকের আমাদের প্রকাশিত বই

সুখ

গৃহসুখ

সাত টাকা বারো আনা

ভারতের শেষ ভূখণ্ড

গাধা

পুরোনো সেই দিনের কথা

এতে আছে



হাসি কান্না চুনী পান্না

আমি যখন ছোট ছিলুম তখন আমার খুব কাশি হত। হলেই হল। শুকনো কাশি, সে বড় ভয়ঙ্কর। তার কোনো কমা, ফুলস্টপ থাকে না। খ্যাকোর খ্যাকোর চলছে তো চলছেই। যে কাশে তার তো কষ্ট হয়ই, যাঁরা শোনেন, তাঁদের কষ্ট আরো বেশি। কাশি তো আর গান নয়, যে সবাই শুনে মোহিত হয়ে যাবেন। কোনো কারণে থামলে বলবেন, 'থামলে কেন, থামলে কেন, চলুক চলুক, বেশ হচ্ছে।' কাশির ধর্মই হল সূর্য ডোবার পরই বাড়বে। অন্ধকারে যেমন প্যাঁচা বেরোয়, বাদুড় বেরোয়, সাপ, কীট-পতঙ্গ বেরিয়ে আসে গর্ত ছেড়ে পিলপিল করে, কাশিও তেমনি মনের আনন্দে গলার গর্ত ছেড়ে বেরোতে থাকে, যত রাত বাড়ে তত কাশি বাড়ে।

আমার বাবা বলতেন, 'ভাগ্য ভাল হলে এই রকমই হয়, বিনা আয়াসে কাশীবাস।' মাঝে মাঝে গবেষণা করতেন, 'আচ্ছা কিভাবে তুমি এটা করো? কায়দাটা কি? পড়ার ভয়ে নকল কাশি বলেও তো মনে হয় না। শতকরা একশো ভাগ খাঁটি কাশি। মুখ আড়াই ইঞ্চি ফাঁক, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে, একেবারে খোলতাই কাশি। আচ্ছা, তোমার একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে না। সিনেমার হাফটাইম আছে, ফুটবল খেলার হাফটাইম আছে, বড় বড় যুদ্ধেও কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি হয়। তোমার কি একটু ইন্টারভ্যাল নিতে ইচ্ছে করে না?'

এর আমি কি উত্তর দোবো! কাশি একেবারে একটা স্বাধীন জিনিস। গলার গর্তে বসবাস করে। যেই রাত নামে খোল-খত্তাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বাবাকে উত্তর দিলেন জ্যাঠামশাই।

'তোমার মতো বুদ্ধিমান, বিবেচক এক মানুষ, এমন একটা ছেলে-মানুষী প্রশ্ন করতে পারলে?'

'হ্যাঁ, পারলুম। কাশিটা হল শুকনো কাশি। আসছে পেট থেকে। গঙ্গার উৎস যেমন গোমুখী, শুকনো কাশির উৎস হল তেমন পেট। পেট

থেকে কাশি বেরিয়ে আসছে কি ভাবে? গরমে। উপমা ছাড়া তুমি বুঝবে না। আমাদের চৌকিতে ছারপোকা হলে কি করি? গরম জল ঢালি।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'প্রশ্ন আছে। পেট কি চৌকি? কাশি কি ছারপোকা? অসম উপমা হল। তুমি উপমা পাল্টাও। প্রাণীর সঙ্গে অপ্রাণী, অপ্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর উপমা চলে না।'

'কেন চলে না? আমরা বলি না, খেয়েদেয়ে সে তাকিয়ার মতো পড়ে আছে। আমরা বলি না, শোকে পাথর হয়ে গেছে। আমরা পড়িনি, পলাশীর যুদ্ধে মিরজাফর দাঁড়িয়ে রইলেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ! রোগা, শীর্ণ মানুষকে আমরা বলি বৃষকাষ্ঠ। তোমার স্বভাবটাই হল, কারণে অকারণে প্রতিবাদ।'

জ্যাঠামশাই হারবার মানুষ নন। তিনি বললেন, 'ও-সব উপমাগুলো দীর্ঘদিন চলে আসছে। তুমি হঠাৎ একটা নতুন উপমা যথেষ্ট প্রচার ছাড়াই চালাতে চাইছ। সুধিজন নেবে কেন! তুমি যদি গায়ের জোরে বলতে চাও, শসার ইংরেজি শসকুইটো!'

'সে আবার কি? আমি তা বলব কেন?'

'কেন বলবে না! মশা যদি মসকুইটো হয়, শসা কেন শসকুইটো হবে না! তুমি বলতেই পারো। তোমার পক্ষে সবই সম্ভব।'

'আজ্ঞে না। সম্ভব নয়। ল্যাঙ্গোয়েজ পাল্টানো যায় না। উপমা আমি মাথা খাটিয়ে নতুন নতুন বের করতে পারি। সে স্বাধীনতা আমার আছে। তোমারও আছে।'

'বেশ, তাহলে আমার প্রতিবাদ তুলে নিলুম। বলো তুমি।'

'আর বলো! এমন ঘুরপাক খাইয়ে দিলে সব গুলিয়ে গেল। তার ওপর কানের কাছে এই ননস্টপ কাশি।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমার যত দূর মনে পড়ছে তুমি ভাগীরথীর উৎস সন্ধানের কথা বলছিলে।'

আমি কোনোরকমে কাশির দমক চেপে বললুম, 'আজ্ঞে না, কাশির উৎস-সন্ধানে।' বলার ফাঁকে ফাঁকে ভুক্‌ভুক্‌ হচ্ছিল। শেষ হওয়ামাত্রই মাঝরাতের কুকুরের মতো ভৌ-ঔ-ঔ করে পেল্লায় এক ডাক ছাড়লাম।

বাবা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ফ্যান্টাস্টিক!

মানুষ যে এইভাবে ডাকতে পারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। তুমি একটা দেখালে বটে!'

জ্যাঠামশাই সংশোধন করে দিলেন, 'ওটা ডাক নয়। কাশি। বাঁধ ভেঙে যেমন জল বেরিয়ে আসে সেইরকম। চাপা ছিল, তেড়ে বেরিয়ে এল।'

'পেট গরম হয়েছে। কেন হয়েছে? না কুপথ্য করেছে। তেলেভাজা, চানাচুর, আচার, ঝাল আলুর দম। পেঁয়াজি, পাঁপড়। এর পেছনে কাঁচা পয়সার খেলা আছে। দুপুরবেলা আইসক্রিম আছে।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'আইসক্রিম ঠাণ্ডা।'

বাবা বললেন, 'সংশোধনের প্রয়োজন আছে। ধারণার সংশোধন। আইসক্রিম ঠাণ্ডা নয়, গরম। যত আইসক্রিম খাবে ততই পেট গরম হবে। এখন একটু অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। এর হাতে কাঁচা পয়সা দিচ্ছে কে? পয়সার উৎসটা কোথায়?'

'তুমি তো কাশির উৎস সন্ধান করছিলে হঠাৎ পয়সায় চলে গেলে। পয়সার উৎস তো টাঁকশাল।'

'আবার আমাকে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। এর কাশি। শুকনো কাশি। মানে পেট গরম। পেটে গরমাগরম জিনিস ঢুকছে। জিনিস এমনি আসে না। পয়সা লাগে। সেই পয়সা এ পাচ্ছে কোথা থেকে? কেউ দিচ্ছে আদর করে। সেই কেউটা কে?'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'সেই কেউ তো তোমার সামনে বসে আছে। আমিই তো সেই কেউ।'

'তুমি? তুমি এইভাবে ওর ফিউচারটা নষ্ট করছ! তুমি পয়সা দিচ্ছ, আর ও সেই পয়সায় যা-তা কিনে কিনে খাচ্ছে। আর কেশে কেশে আমাদের শুধু নয়, গোটা পাড়ার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। কোনো অচেনা মানুষ আমাদের বাড়ি জানতে চাইলে, পাড়ার লোক কি-ভাবে চেনায় জানো, সোজা চলে যান, কাশির শব্দ শুনতে পাবেন। ওইটাই প্রকাশবাবুদের কাশীধাম। এর চেয়ে লজ্জার, এর চেয়ে অপমানের কি আছে!'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'এইটাই তো খাওয়ার বয়স। এই বয়সে খাবে, না তো কোন বয়সে খাবে?'

'কাঁচা পয়সা হাতে না দিয়ে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জিনিস কিনে দাও।'

'কোন কোন জিনিস ঠাণ্ডা ?'

'যেমন ধরো, বাতাসা, কুমড়োর বরফি, পাকা পেঁপে, ডুমুর, মুড়কি, খই, চিঁড়ে, কদমা।'

'খাস্তা কচুরি, ঝুরিভাজা, ডালবড়া।'

'বিষ, বিষ। ঘিয়ে ভাজা কোনো কিছু চলবেই না। হালকা, সহজে হজম হয় এমন জিনিস খেতে হবে।'

'আচ্ছা, ওর টনসিলটা একবার দেখালে হয় না। কাশি টনসিল থেকেই হয়।'

'পেট থেকেও হয়।'

'বুক থেকেও হয়।'

'এটা পেটের।'

'এটা গলার।'

'আমি বলছি, এটা পেটের।'

'আই সে ইট ইজ থ্রোট।'

'আই সে দিস ইজ বেলি।'

'থ্রোট।'

'বেলি।'

'থ্রোট, বেলি, বেলি, থ্রোট', শুনে অন্দরমহল থেকে সবাই ছুটে এলেন। সবার আগে এলেন দাদু। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কিসের এই শব্দকল্পদ্রুম !'

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'কাশির।'

'ইংরিজি কাশি ?'

'বাংলা কাশিটাই হঠাৎ কি ভাবে ইংরিজি হয়ে গেল।'

'সায়েবদের কীর্তি। ছিল কাশি, হল বারাণসী, শেষে বেনারস। তা তোমাদের এই ভয়ঙ্কর ফাটাফাটির কারণটা জানতে পারি ? আমার পুজো মাথায় উঠে গেল।'

দাদু পুজোর কাপড় পরে আছেন। হাতে জপের মালা দুলছে।

বাবা বললেন, 'এ কাশি পেটের।'

জ্যাঠামশাই টেবিল চাপড়ে বললেন, 'আলবাত নয়। এ কাশি গলার।'

দাদু বললেন, 'কার কাশি !'

বাবা আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই যে এর খ্যাঁকখেঁকে কাশি। আপনিই বলেছিলেন, শুকনো কাশি পেটের কাশি। পেট গরম হলেই হয়।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'ও, আপনি বলেছিলেন, তাহলে আমি তর্ক করতুম না। বেশ, এটা পেটের কাশি। নেক্‌স্ট পয়েন্ট, সারবে কিসে?'

দাদু বললেন, 'ভেরি সিম্পল। নেচারোপ্যাথি। গঙ্গার মাটি গুঁড়ো করে, মিহি করে, তিলের তেল মিশিয়ে জল দিয়ে কাদাকাদা করে, তলপেটে লেপে দাও। আর তিন দিন শুধু লাউপথ্য।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'লাউপথ্য কাকে বলে?'

দাদু বললেন, 'ভেরি সিম্পল। লাউ যার পথ্য। তুমি তো আবার সায়েবমানুষ, নিরামিষের খবরই রাখো না। সাদা সাদা, লম্বা লম্বা এক ধরনের ফল আছে, তার নাম লাউ। সংস্কৃত হল অলাবু। চিংড়ির সঙ্গে ভোগীর প্রিয়, প্লেন অ্যাণ্ড সিম্পল হল যোগীর আহার। শুদ্ধসত্ত্ব। সেই লাউ সেদ্ধ করা থাকবে। খিদে পেলেই খাও।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'মরে যাবে। কাশির সঙ্গে কেশো দুজনেই চলে যাবে। তাছাড়া পেটে ওই মাটির প্রলেপ, নিমোনিয়া হয়ে যাবে।'

বাবা বললেন, 'তোমার অ্যানাটমির জ্ঞান সাংঘাতিক। কোথায় পেট আর কোথায় লাংস! এগুলো তো একটু শিখতে পারো। ভাস্ট ইগনোরেন্‌স। অজ্ঞানের আটলান্টিক।'

দাদু বললেন, 'সংযম, সংযম। ব্রাইড্‌ল ইওর টাং। যে জানে না, তাকে তিরস্কার কোরো না। তাকে বোঝাও। তবে হ্যাঁ, একটা সম্ভাবনা আছে, আমাশা হয়ে যেতে পারে। সে তবু মন্দের ভাল। বিনিদ্র রজনী কাটাতে হবে না। আর আমাশার সহজ ওষুধ, থানকুনি পাতা। বাটো আর খেয়ে নাও একদলা।'

আমি বললুম, 'দাদু, আপনি বলেছিলেন, আমাশার ওষুধ গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি।'

'হ্যাঁ, সেটাও হতে পারে।'

'তাহলে আজই আমার পেটে মাটি লেপে দিন।'

'এই রাতে তো তা সম্ভব নয়। কাল নিজে পুলটিস তৈরি করে

তোমাকে অয়েল ক্লথে ফেলে হবে।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'হোয়াই নট হোমিওপ্যাথি ?'

বাবা বললেন, 'হোয়াই নট নেচারোপ্যাথি !'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'কারণটা রোগীর পক্ষে অতিশয় অপমানজনক। ওর বয়সের একটা ছেলে অয়েল ক্লথের ওপর উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে, আর তলপেটে একগাদা মাটি। সেই সময় ওর বন্ধুরা যদি কেউ ডাকতে আসে !'

বাবা বললেন, 'তখন বলা হবে, দেখা হবে না। ও এখন নেচার-ক্লিনিকে মাড বাথ নিচ্ছে। হয়ে গেল, মিটে গেল ঝামেলা।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'এটা একটা টর্চার।'

দাদু বললেন, 'আর এক হয় কবিরাজী।'

বাবা বললেন, 'কবিরাজীতে আমার অ্যাবসলিউটলি কোনো ফেথ নেই। খল, নুড়ি, ডালপালা।'

দাদু বললেন, 'তোমার তো কোনো কিছুতেই বিশ্বাস নেই। তা তুমি তাহলে তোমার মতেই চলো।'

'আজ্ঞে না, আমি ডিকটেটার নই। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ছেলে হল, একটা স্টেট, একটা রাজ্যের মতোই। এই বাড়ির সবাই যা ব্যবস্থা নেবেন তাই হবে। আর আমি তো আপনার কর্দমচিকিৎসা সমর্থন করেছি। এর পর তো আর কোনো কথা নেই।'

অন্দরমহল থেকে ডাক পড়ল, 'আর ভাল লাগছে না কাশিপর্ব, এইবার আহারপর্বে আসতে হবে। বাবা, আপনার পুজো শেষ করে নিন তাড়াতাড়ি।'

দুই

খাবার ঘরে পরপর আসন পড়েছে। রান্নাঘরে বামুনদি প্রাণ খুলে লুচি ভাজছেন। গন্ধে জিভে জল এসে যাচ্ছে। নতুন ফুলকপি উঠেছে। বড় বড় বেগুনভাজা। মা আর জ্যাঠাইমা খুব ব্যস্ত। আমি ছোট বলে, আমার ছোট থালা। দুখানা ধবধবে সাদা ফুলকো লুচি পড়েছে পাতে। বেগুনভাজা পাশ ফিরে শুয়ে আছে। হঠাৎ বাবা বললেন, 'না, না,

অসম্ভব। লুচি খাবে কি? যার এই ভয়ঙ্কর কাশি! পেটে বেশি লোড চাপানো ঠিক হবে না। লাইট, ভেরি লাইট।'

জ্যাঠামশাই ফুলকো লুচিতে একটা আঙুল ঢোকালেন। ফুস্ করে একটু ধোঁয়া বেরিয়ে গেল। দাদু চোখ বুজিয়ে ঈশ্বরকে নিবেদন করেছেন। দাদু চোখ খুলে বললেন, 'কি বললে?'

'ওর লাইট কিছু খাওয়াই উচিত। লুচি, কপি, ভেটকি মাছ রাত্তিরে চলবে না।'

'কি চলবে তাহলে?'

'খই, দুধ।'

'ও খই-দুধ খাবে। আমরা খাবো রাজভোগ? এ যে দেখি কাজীর বিচার!'

'ওর কাশি ভদ্রতার সমস্ত লিমিট ছাড়িয়ে গেছে। এরপর আমাদের ওপর পাড়া ছাড়াব নোটিস আসবে।'

'শোনো, বাইবেলে আছে, হেট দি সিন, নট দি সিনার। কাশিকে মারো ছেলেটাকে মেরো না। ও যা খাচ্ছে তাই খাবে। তোমাদের ঘরে শুলে যদি অসুবিধে হয়, ও আমার কাছে শোবে। আমি সারারাত জেগে থাকি, ও-ও সারারাত জাগবে আমার সঙ্গে। সংস্কৃতে উইক। সারারাত ওকে আমি সংস্কৃত পড়াবো। দেখো অসুখটার নাম কাশি। মহাতীর্থের নাম কাশী। কাশির কল্যাণে যদি মহাপণ্ডিত হতে পারে, সেটা হবে শাপে বর।'

সংস্কৃতের নাম শুনে লুচি আমার মাথায় উঠে গেল। বললুম, 'থাক গে, আমি খাবো না।'

জ্যাঠামশাই আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'নির্ভয়ে খাও। আমি আছি। তুমি আমার কাছে শোবে। তেমন হলে সারারাত তোমাকে আমি গল্প শোনাবো। এভারেস্ট অভিযানের গল্প, অ্যান্টার্টিক অভিযানের গল্প। সাহারার গল্প।'

'সমস্ত দায়িত্ব তোমাদের।' বাবা আহার শুরু করে দিলেন।

জ্যাঠামশাই আমাকে বললেন, নির্ভয়ে চালিয়ে যাও। লুচি তোমার ফেভারিট সাবজেক্ট। ফুল মার্কস পাওয়া চাই।

শেষ পাতে এল ক্ষীর। বাবা বললেন, 'চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। হোল ফ্যামিলি আজ জাগবে।'

দাদু বললেন, 'কেন অশান্তি করছ। তুমি তো সারারাত জেগে জেগে অঙ্ক করো। কত ঘুমোও, সে তো জানাই আছে। শেষ পাতে ক্ষীর শাস্ত্রের বিধান। অশাস্ত্রীয় কাজ কেমন করে হয়!'

'আর একটু পরে শাস্ত্র, অশাস্ত্র সব বেরোবে গলা ফেঁড়ে।

খাওয়া শেষ হল। জ্যাঠামশাই কানে কানে বললেন, 'তুমি কিছুক্ষণ আমার ঘরে থাকো। দুম করে এখনি শুতে যেয়ো না।'

লুচি দেখলে আমার জ্ঞান থাকে না। খেয়েছিও তেমনি। পরিণামের কথা না ভেবেই। পেট ফুলে জয়ঢাক। এতক্ষণ কাশি বন্ধ ছিল। লক্ষ্য করেছি অন্যমনস্ক থাকলে কাশতে ভুলে যাই। পড়তে বসলেই কাশি আসে। স্কুলে গেলেই কাশি পায়। আবার অঙ্কের স্যার ক্লাসে এলেই মারের ভয়ে কাশি চুপ করে যায়। আমার কাশিটা মহাপাজি আছে।

সব কাজ শেষ করে জ্যাঠাইমা ঘরে এলেন। জ্যাঠাইমা আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। আঁচল থেকে একটা কাগজের মোড়ক খুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এতক্ষণ বসে বসে তোমার জন্যে এই দাওয়াইটা করে এনেছি। আমার মায়ের কাছে শেখা। তালমিছরি, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল আর লবঙ্গ সব একসঙ্গে হামানদিস্তেতে ফেলে গুঁড়ো করা। খেতেও ভাল। যেই কাশি পাবে মুখে একচিমটে ফেলে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে কাজ।' জ্যাঠামশাইকে বললেন, 'দুজনে মুখোমুখি বসে থ্রোট, বেলি, বেলি, থ্রোট না করে, ছেলেটাকে একজন ভাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও না।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'একার মতে হবে না। মিটিং কল করে, সকলের পরামর্শ নিয়ে করতে হবে। কোন ডাক্তার? অনেক ডাক্তার আছেন।'

'তাহলে কাল সকালে, চায়ের সময় মিটিং ডাকো।'

'তাহলে আজ রাতেই নোটিস দিতে হবে।'

'দিতে হবে তো দিয়ে এসো। আর ফেলে রাখা যায় না। ছেলেটার কষ্ট হচ্ছে।'

বাবা বলছিলেন, 'ছোটরা যত কাশে ততই ভাল। পেট বড় হয়। বেশি খেতে পারে। এই বয়সে যত খাবে ততই স্বাস্থ্য বাড়বে।'

'আর পেট বেড়ে দরকার নেই। তুমি কাজের কাজ করো।'

জ্যাঠামশাই ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। জ্যাঠাইমা বললেন, 'তোমার মাকে দিয়ে হবে না। নিরীহ, ভালমানুষ। ব্যাটাছেলেরা কিছু না

করলে, এইবার আমাকেই চেঁচামেচি করে একটা কিছু করতে হবে। ডক্টর ভট্টাচার্য আমাকে খুব চেনেন। চেম্বারে নয়, সোজা বাড়িতে নিয়ে যাবো। তোমাকে একটা কায়দা শিখিয়ে দি, যখনই কাশি পাবে, একটা ভাল কিছু ভাববে। মনে করবে, তুমি একটা সমুদ্রে ভাসছ। ছোট্ট একটা নৌকো। ঘন কালো রাত। আকাশে ছড়িয়ে আছে খইয়ের মতো তারা। শুধু জল আর জল। ফসফরাস জ্বলছে ঢেউয়ের মাথায়। বহুদূরে একটা জাহাজ নাচছে। কেবিনে কেবিনে পুটপুট আলো জ্বলছে। তোমার কাছে রেডিও সংকেত পাঠাবার একটা যন্ত্র। তুমি চেষ্টা করছ জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে যোগাযোগ করার। মাঝে মাঝে পারছ, মাঝে কেটে যাচ্ছে। ঢেউ ছিটকে আসছে। জাহাজটার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারলে মহাবিপদ। চোখের সামনে দেখার চেষ্টা করবে সমুদ্র, আকাশ, তারা, জাহাজ, ঢেউ। গায়ে তোমার ঠাণ্ডা বাতাস লাগবে। এইটা যদি করতে পারো, তোমার কাশি থেমে যাবে। আরো একটা কায়দা আছে, মনে করো তুমি একটা মই বেয়ে ধাপে ধাপে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছ। নারকেল গাছের মাথা। মাথা ছাড়িয়ে আরো উঁচু। আরো আরো উঁচু। পৃথিবীর বাড়িঘর সব অদৃশ্য। মেঘের মধ্যে ঢুকে গেছে। মেঘ ছাড়িয়ে আকাশের আরো উঁচুতে। তারাগুলো ক্রমশই বড় হচ্ছে। চাঁদ ছাড়িয়ে উঠে যাচ্ছে আরও উপরে। তুমি উঠছ, তুমি উঠছ। কি মজা! জানতো এই ভাবে ধ্যান করতে হয়। এতে মন ভাল হয়। মন একাগ্র হয়। লেখা-পড়া ভীষণ ভাল হয়। তুমি রাতে শুয়ে শুয়ে অভ্যাস করবে।

জ্যাঠামশাই ঘরে এলেন, এসে বললেন, 'ঘরে ঘরে গিয়ে নোটিস জারি করে এলুম। সকাল সাড়ে সাতটায় মিটিং। তোমরা সব যোগ দেবে, উইদাউট ফেল।'

আমার পেল্লায় একটা হাই উঠল। জ্যাঠামশাই আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'ঘুম আসছে বাপী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এই ছেলেটা ভীষণ ভাল। কাশি একটু কম?'

'এখন আর হচ্ছে না।'

'তাহলে শোয়ার চেষ্টা করে দেখবে?'

'তাই দেখি।'

'গুড নাইট।'

'গুড নাইট। জ্যাঠাইমা গুড নাইট।'

'গুড নাইট সোনা।'

দাদুর ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখলুম, দাবা-বোড়ের ছক সাজিয়ে বসেছেন। বৃদ্ধ মানুষ, রাতে ঘুম আসে না, একা একা জাগেন। ভোরের দিকে শুয়ে পড়েন। ঘণ্টাখানেকের ঘুম। বাবা টেবিলে। টেব্‌ল ল্যাম্প জ্বলছে। গণিতের মোটা বই খোলা। অঙ্ক তাঁর খেলা।

মায়ের পাশে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লুম। টেবিলের আলোটা এমনভাবে ঢাকা দেওয়া যাতে আমাদের চোখে না লাগে। বাবার সামনে মা আমাকে আদর করার সাহস পান না। বাবা বলে দিয়েছেন, ছেলেদের বেশি আদর দেবে না। বেশি আদরে সব আলালের ঘরের দুলাল তৈরি হয়। আদর মনে রাখবে।

বাবা অঙ্কে ডুবে আছেন। এই সুযোগে মা আমাকে একটু আদর করে নিলেন। মা আমাকে পাশ-বালিশের মতো জড়িয়ে ধরে শুতে ভীষণ ভালবাসেন। আর ওই সময়টায় মনে হয়, আমি যেন স্বর্গে আছি। আমার মা তো ভীষণ ভাল। জ্যাঠাইমা বলেন, 'ভগবান তোকে কোন মাটি দিয়ে তৈরি করেছিল রে উমা।' মায়ের বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকার সময় মনে হয়, আমার কোনো ভয় নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, কাশি নেই, মা ছাড়া পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। মায়ের একটা নরম হাত আমার পিঠের ওপর দিয়ে ওপাশে চলে গেছে। ভারি একটা পা আমার কোমরে। আলতো একটা হাত আমার চুলে। মায়ের শরীর সব সময় বরফের মতো শীতল। গা দিয়ে হালকা একটা গোলাপের গন্ধ বোরোয়। জ্যাঠাইমা বলেন, সারাক্ষণ যাঁরা ভগবানে মন ফেলে রাখেন, তাঁদের চেহারায় একটা আলো ফোটো, শরীর পদ্মফুলের মতো নরম, ঠাণ্ডা হয়। সুবাস আসে।

মায়ের কোলের ভেতর আরামসে ঢুকে গিয়ে জ্যাঠাইমার শেখানো সেই ধ্যানটা অভ্যাস করতে লাগলুম। আমার মা যেন একটা সাদা নরম, পেঁজা তুলোর মতো মেঘ। আমি সেই মেঘে শুয়ে আছি। মেঘটা ধীরে ধীরে আমাকে নিয়ে আকাশের দিকে উঠছে। ওপরে, আরো ওপরে। শেষে চলে এলুম চাঁদের কাছে।

হঠাৎ বাবা, অঙ্কের খাতা থেকে মুখ তুলে বললেন, 'কি হল আর কাশছে না কেন?'

আমি তখন চাঁদের পাহাড়ে। পাহাড়টা রুপোর। হীরের ফুল ফুটে আছে। দুধের ঝরনা। মা বলছেন, 'পেট খালি থাকলেই কাশি বাড়ে।'

বাবা বলছেন, 'অ্যাবসলিউটলি ভুল ধারণা, পেট ভরা থাকলে কাশি আরো বাড়ে।'

মা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। আমি আমার দু-আঙুল দিয়ে মায়ের পাতলা পাতলা ঠোঁট দুটো চেপে ধরলুম। মায়ের নাকে ছোট্ট একটা নোলক আছে। আমার দাদু পরিয়ে দিয়েছেন। পাতলা নাকে নোলক নাকি ভীষণ মানায়। দুর্গা ঠাকুরের নাকে নোলক আছে। সেই নোলকটা আমার আঙুল ছুঁয়ে আছে।

আমি কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়লুম।

তিন

দাদু সকালে বেশ কিছুক্ষণ গীতাপাঠ করেন অপূর্ব ভরাট সুরে। মা দাদুর সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজান। রাজস্থানী গালচে। সামনে বাগান থেকে তুলে আনা টাটকা কিছু ফুল সুন্দর একটা সাজিতে। দূরে ঘরের কোণে একটা ধূপ জ্বলছে। সামনের দেয়ালে শ্রীকৃষ্ণের ছবি। রথ চালাতে চালাতে অর্জুনের দিকে ফিরে তাকিয়ে কিছু বলছেন।

বাবা এই সময়টায় ভয়ঙ্কর ব্যায়াম করেন। দেখলেই ভয় করে। ডন মারছেন তো মারছেন। লাফা-বৈঠক। আমি একদিন বাবার দেখাদেখি দুপুরে চেষ্টা করতে গিয়ে ঘাড়মুখ গুঁজরে অ্যায়সা উল্টে পড়েছিলুম, শব্দে মা আর জ্যাঠাইমা দুজনেই বোনা ফেলে ছুটে এসেছিলেন। ধরাধরি করে তুলে, জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথা থেকে পড়লে? ঘরে তো কিছুই নেই। জানলায় উঠেছিলে বুঝি!'

'বাবার মতো লাফা-বৈঠক মারার চেষ্টা করেছিলুম।'

ব্যাপারটা কিন্তু বহুত সুন্দর, আর বাবা এত তাড়াতাড়ি মারেন, যেন ছবির মতো। এক লাফে সামনে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে বসে পড়েন, আবার এক লাফে পেছনের জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়েন। কোনো সময় গোড়ালি মাটিতে ঠেকে না। শরীরটা সামনে একটু ঝুঁকে থাকে।

বৈঠকের স্পিডও খুব সাংঘাতিক। পেণ্ডুলামের মতো যাচ্ছেন, আসছেন, আসছেন, যাচ্ছেন।

দুটো বিশাল মুগুর আছে। সব শেষে সেই মুগুর ভাঁজা। ঘেমে একেবারে নেয়ে যাবেন। সারা শরীরের গুলি ঠেলে ঠেলে উঠবে। বুকটা পাথরের মতো চওড়া হয়ে যাবে। তখন বাবার কাছে যেতে ভয় করে।

জ্যাঠামশাই এই সময়টা সবচেয়ে ভাল কাটান, আমার মতে। ধবধবে সাদা একটা ধুতি দুভাঁজ করে পরা। দুধের মতো সাদা হাতঅলা গেঞ্জি। নিচের বাগানে বিশাল এক বাঁধানো চৌবাচ্চা। ভর্তি জল, টলটল করছে। সেই জলে অসংখ্য মাছ। জ্যাঠামশাই একটা একটা করে মুড়ি ফেলছেন। এক একটা মাছ লাফিয়ে উঠে কপাক কপাক কবে খাচ্ছে। কখনো এক মুঠো ফেলছেন, মাছের ঝাঁক তেড়ে আসছে। গাছের ডালে পাখি। নানারকম। দোয়েল, বুলবুলি, শালিক, গাংশালিক, ছাতারে, টুনটুনি, চড়াই। তাদের জন্যেও ব্যবস্থা আছে। মুঠো মুঠো ডাল। জ্যাঠামশাই একবার পাখিদের দিচ্ছেন. একবার মাছেদের। আমি সবসময় জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গী।

জ্যাঠাইমা এই সময় ব্যস্ত থাকেন চায়ের পাট নিয়ে। খুব ভোরে তাঁর স্নান হয়ে যায়। মা-জগদ্ধাত্রীর মতো জ্বলজ্বল করে তাঁর মুখ। পরিষ্কার শাড়ি। কুচকুচে কালো চুল। দাদু চায়ের ব্যাপারে ভয়ঙ্কর খুঁতখুঁতে। জ্যাঠাইমা চা না করলে তিনি খেতে পারেন না। একটু খেয়েই ফেলে দেন। জ্যাঠাইমার একেবারে ঘড়ি ধরা সময়। ঠিক সাতটা বাজল। জ্যাঠাইমা দোতলার বারান্দা থেকে ডাকলেন, 'সব চলে এসো। চা হয়ে গেছে।'

জ্যাঠামশাই সব মুড়ি একেবারে চৌবাচ্চায় ফেলে দিলেন, ডালগুলো ছড়িয়ে দিলেন মাটিতে। দিয়ে বললেন, 'চলো চলো, মিটিং অ্যাটেণ্ড করতে হবে।'

'আমার যে মাস্টারমশাই আসবেন।'

'আরে কতক্ষণের ব্যাপার! মাস্টারমশাইকেও আমরা মিটিং-এ নিয়ে নেবো। তাঁর মতামতেরও দাম আছে। তিনি তোমার শিক্ষক। প্রবীণ মানুষ।'

ঠিক সাড়ে সাতটার সময় শুরু হল। বাইরের ঘর একেবারে জম-

জমাট। দাদুর পাশে আমার মাস্টারমশাই। উল্টোদিকে পাশাপাশি বাবা আর জ্যাঠামশাই। বাঁ দিকে মা আর জ্যাঠাইমা। ডানদিকে আমি একা পড়ে গেছি। ভয় ভয় করছে। অস্বস্তি লাগছে। হঠাৎ যদি সবাই বলেন, 'একে হাসপাতালে ভর্তি করে দাও। টনসিল অপারেশান।'

দাদু বললেন, 'কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটা। লেট আস বিগিন। শঙ্করবাবু......।'

শঙ্করবাবু আমার মাস্টারমশাইয়ের নাম। ভয়ঙ্কর রাশভারি মানুষ। গম্ভীর গলা। তেমনি পণ্ডিত।

দাদু বলছেন, 'শঙ্করবাবু, আমাদের প্রধান সমস্যা হল কাশি। কাশি কমছে না।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'কার কাশি?'

'আপনার ছাত্রের।'

'ছোটদের কাশি-সর্দি হতেই পারে। তার জন্যে এত চিন্তার কি আছে!'

বাবা বললেন, 'কাশি সমস্ত ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। ও তো আর কথা বলারই সুযোগ পাচ্ছে না, শুধু কেশেই যাচ্ছে। ওর জন্যে তো তাহলে নতুন ভাষা তৈরি করতে হবে, কাশির ভাষা, পাখির ভাষার মতো।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'এই তো এতক্ষণ বসে আছে, একবারও কেশেছে?'

সবাই হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি যেন এক বীর। না কেশে ফার্স্ট হয়েছি। সোনার মেডেল পেয়েছি। বাবা বললেন, 'সত্যিই তো, তখন থেকে বসে আছে, খুক্‌খুক্‌ খ্যাঁকখ্যাঁক কিছুই নেই। কি করে এমন হল?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'বুঝতে পারলেন না সাইকোলজিক্যাল কারণ। যখন নিজেতে নিজে থাকে মনটা চলে যায় কাশিতে। কাশি হল গলার ইরিটেশান। সেই জায়গাটা উত্তেজিত হয়। আর ও যখন দেহের বাইরে নিজেকে ভুলে থাকে তখন কাশি হয় না। এটা নার্ভের ব্যাপার।'

বাবা বললেন, 'তাহলে ও বাইরেই থাক না।' জ্যাঠামশাই মনে হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, চমকে উঠে বললেন, 'বাইরে থাকবে কি? এই রোদে রাস্তায় রাস্তায় কোথায় ঘুরবে!'

বাবা বললেন, 'ঠিক এইরকম। তোমার দেহটা এইখানে, মনটা অন্য জায়গায়, আগের কথা কিছুই শোনেনি। সত্যি কথা বলবে, একটু আগে তুমি কোথায় ছিলে?'

'নাটাগড়ের একটা পুকুরের ধারে।'

'সেখানে কি করতে গিয়েছিলে?'

'মাছ ধরতে।'

'ঠিক সেইরকমের বাইরে থাকা। মনটাকে দেহের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'কাল ওকে আমি সেই কায়দাটা শিখিয়ে দিয়েছি। মনটাকে বেড়াতে পাঠিয়ে দেওয়া।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'ওয়েল ডান।'

দাদু বললেন, 'তাহলে তো হয়েই গেল। কাশি তো ওকে সাধনার দিকে নিয়ে যাবে।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'ওকে একবার জিজ্ঞেস করা যাক। আমি তো নাটাগড়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম, ও তখন থেকে কোথায় গেছে।' জ্যাঠামশাই দু'বার তালি বাজিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে তুমি কোথায় আছো!'

আমি বললুম, 'তখন থেকে আমি এখানেই আছি।'

বাবা প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে কাশছ না কেন?'

'আজ্ঞে, মাস্টারমশাইয়ের ভয়ে। উনি কাল যে টাস্ক দিয়েছিলেন তার একটাও হয়নি।'

বাবা আঁতকে উঠলেন, 'টাস্ক করোনি? কি সর্বনাশ! কাল সারাদিন তাহলে কি করলে? মোস্ট ডিসগ্রেসফুল। অফুরন্ত ফাঁকি। এই ভাবে তো কেরিয়ারটাই জখম হয়ে যাবে। আজ বাদে কাল কাশি ভাল হয়ে যাবে; কিন্তু জীবন গঠনের জন্যে সময় বসে থাকবে না। দুপুরবেলা এর দায়িত্বে কে আছে? কাম ফরোয়ার্ড।'

জ্যাঠাইমা বললেন, আমি আছি।'

বাবা একটু সমীহ হলেন। জ্যাঠাইমাকে ভয়, শ্রদ্ধা দুটোই করেন। বেশ নরম গলায় বললেন, 'একটা দুপুর যে নষ্ট হয়ে গেলো বউদি! অমূল্য একটা দুপুর!'

'নষ্ট তো হয়নি ঠাকুরপো। তুমি যে টাস্ক দিয়েছিলে, সেই টাস্ক

করতে করতেই সন্ধে। ছেলে তো একটাই ঠাকুরপো!'

'মাস্টারমশাই দিয়েছেন জানলে আমি দিতুম না। আমারটা না করলেই হত।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'তাহলে কুরুক্ষেত্র হত।'

মাস্টারমশাই মৃদু হেসে বললেন, 'আপনারা কি আমার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছেন?'

বাবা বললেন, 'না, না, তা কেন, তা কেন?'

'তাহলে আপনি কেন টাস্ক দিচ্ছেন? আমি তো একটা লাইন ধরে চলেছি, একটা মেথড। আমার পরিশ্রমের তো তাহলে কোনো মানে হয় না। এ তো আমার ইনসাল্ট! আমি আর পড়াব কি না, আমাকে ভাবতে হচ্ছে।'

মাস্টারমশাইয়ের কথায় সকলের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। দাদু হঠাৎ হাসতে হাসতে বললেন, 'মাস্টারমশাই, আপনাকে আমরা ভয়ংকর শ্রদ্ধা করি। পরিবারেরই একজন ভাবি। আপনি জিনিসটাকে ওই ভাবে নেবেন না। না জেনে হয়ে গেছে। যেমন ভুল করে চায়ে দুবার চিনি, বা মনে করুন আমার দুই বউমা রান্নাঘরে। ডাল ফুটছে, এ একবার এক খাবলা নুন দিলে, ও আবার আর এক খাবলা।' উদ্দেশ্য কারোরই অসৎ নয়। সবাই ভাল করারই চেষ্টা করছেন। অকজন আর একজনকে সাহায্যই করতে চাইছেন।

জ্যাঠাইমা বললেন, 'আপনাদের অনুমতি নিয়েই বলছি, টাস্কের ধরনটা সেই একই, অংক, ইংবেজি থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ, জ্যামিতির একস্ট্রা।'

দাদু বললেন, 'আহা, তাই তো হবে! ভাত, ডাল, তরকারি, তরকারি, ডাল, ভাত এই তো আমার পথ্য। মাস্টারমশাই, আপনি তাহলে প্রশান্ত চিত্তে মার্জনা করে দিন।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'দিলুম।'

দাদু বললেন, 'তাহলে আমরা পূর্ব বিষয়ে ফিরে যাই, কাশিতে।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'কেন অকারণ কালহরণ করছেন, এতক্ষণ ছেলেটাকে পড়ালে কাজ হত।'

দাদু বললেন, 'আর পাঁচটা মিনিট। প্রসঙ্গটা যখন উঠেছে, তখন আপনার উপস্থিতিতে একটা সমাধান করে ফেলা যাক। ব্যাপারটা যখন

নার্ভের, মানে মনস্তাত্ত্বিক কারণ, তখন সেইরকম কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নিলে কেমন হয়।

বাবা বললেন, 'মানে কোনো পাগলের ডাক্তার? এটা কি তাহলে পাগলের কাশি? শব্দটা করে কিন্তু ছাগলের মতো।'

মাস্টারমশাই গম্ভীর মুখে বললেন, 'পাগল কখনো কাশে না। পাগলদের কখনো কোনো অসুখ করে না, কারণ তারা অবোধ। বিশ্বাস করুন, আমার আর কাশি কাশি ভাল লাগেছে না। পাগল ও নয়, পাগল আপনারা।'

দাদু বললেন, 'সংসারে একটিমাত্র ছেলে তো, তাই সবাই একটু বেশি উতলা হয়ে পড়ি।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'একটা কথা বলি মুকুজ্যেমশাই, বেশি মনোযোগ দেবেন না। ছেলেকে একটু হেলাফেলা করে মানুষ করাই ভাল। তাতে ভবিষ্যৎ ভাল হয়। আজ আপনারা ঘিরে আছেন, কাল যখন আপনারা থাকবেন না। কেউই চিরকাল থাকবে না। জগৎ-সংসারের নিয়ম আগে এলে আগে যেতে হবে, পরে এলে পরে। যাই হোক আমি এক কথায় সব সমাধান করে দিচ্ছি, ওকে আমি ডক্টর মজুমদারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। শিক্ষার দায়িত্ব যখন আমার, স্বাস্থ্যের দায়িত্বও আমার।'

বাবা বললেন, 'পারফেক্ট সলিউশান।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমি বলেছিলুম, মাস্টারমশাই ঠিকই একটা রাস্তা বের করবেন।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'সকাল থেকেই আজ বেশ উত্তরের বাতাস ছেড়েছে, গলায় কি একটা মাফলার জড়িয়ে দেবো?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা পড়েছে, সাবধান হওয়াই ভাল।'

গলায় মাফলার জড়ালে ভীষণ বোকা বোকা লাগে। তবু জড়াতেই হল। গুরুজনের আদেশ।

চার

মাস্টারমশাইকে দেখেই ডাক্তারবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ালায় স্টেথিসকোপ। ঘরভর্তি রোগী। কেউ কোঁত পাড়ছেন। একজন মনবরত হেঁচেই চলেছেন। আমার কাশিরোগের মতো তাঁর হাঁচি রাগ। ডাক্তারবাবুকে খুব সুন্দর দেখতে।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'বলুন, মাস্টারমশাই। কার অসুখ?'

'এই ছেলেটাকে দেখতে হবে। আমার খুব প্রিয় ছাত্র। মুকুজ্যে-াশাইয়ের নাতি। কাশি হয়েছে। কিছুতেই কমছে না।'

'আপনি পাশের ঘরে বসুন মাস্টারমশাই, আমি এখনি আসছি।'

পাশের ঘরটা খুবই সুন্দর। বেশ সাজানো। দেয়ালে মানুষের দহের ভেতরের ছবি। আমাদের দেহের ভেতরটা বিশ্রী দেখতে। ঘেন্না রে। পেশী, শিরা-উপশিরা। দেখলেই ভয় করে। মাস্টারমশাই টেবিল থকে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিলেন। আর দেখতে দেখতে তলিয়ে গলেন। আমি ছবি দেখছি। বাচ্চা ছেলে হাসছে। মায়ের কোলে ছেলে। সে আছি। বসেই আছি। ঘরে একটা ঘড়ি। প্রায় একঘণ্টা পার হয়ে গল। মাস্টারমশাই তন্ময় হয়ে পাতার পর পাতা উল্টেই যাচ্ছেন। ালায় আমার সাতপাট মাফলার। গরমে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। দেড়ঘণ্টা য়ে গেল। শেষে ভয়ে ভয়ে মাস্টারমশাইকে বললুম, 'দেড়ঘণ্টা হয়ে গল।'

পড়ায় ডুবে আছেন, বললেন, 'হুঁ।'

আরো পনেরো মিনিট পার হয়ে গেল, বললুম, 'মাস্টারমশায়, দু'ঘণ্টা হয়ে গেল!' এইবার চমকে উঠলেন, কারণ যে-প্রবন্ধটা পড়ছিলেন, টা শেষ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, সেকি দু'ঘণ্টা হয়ে গেল! শ্চর্য! চলো দেখি।'

পাশের রোগী দেখার ঘর একেবারে খালি। কেউ কোথাও নেই। রিষ্কার সাজানো টেবিল। যেন ভোজবাজি। যাদুদণ্ড ঘুরিয়ে সব দৃশ্য করে দিয়েছেন কোনো যাদুকর! মাস্টারমশাই বললেন, 'কি লা ব্যাপারটা!' ওপাশে আরো একটা ঘর। সেই ঘরে কম্পাউন্ডারবাবু

ওষুধ তৈরি করেন। আমাদের গলা শুনে তিনি বেরিয়ে এলেন। মাস্টারমশাই প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের বসতে বলে কোথায় চলে গেল !'

কম্পাউণ্ডারবাবু বললেন, 'আপনারা বসেছিলেন পাশের ঘরে ? ডাক্তারবাবু তো চেম্বার শেষ করে জরুরি কলে বেরিয়ে গেলেন।'

'কখন ফিরবে ?'

'তা তিনটে চারটে তো হবেই। অনেক কল আজ। আজকাল ওঁর ভীষণ ভুলোমন হয়েছে।'

'ডাক্তারের ভুলোমন হলে তো রোগীদের সমূহ বিপদ।'

'আজ্ঞে, অল্প-বিস্তর বিপদ যে হচ্ছে না তাই বা বলি কেমন করে !'

মাস্টারমশাই আমার কাঁধে হাত রেখে সোজা রাস্তায় বেরিয়ে এসে বললেন, 'জগৎটা কেমন মৌখিক, আন্তরিকতা-শূন্য, কমার্শিয়াল হয়ে যাচ্ছে দেখেছো ! সবাই যেন সেলসম্যান। সবই যেন কথার কথা। আমার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রের ব্যবহার দেখে অবাক। কখনো আর এর কাছে আসব না। পসার হয়েছে, পয়সা হয়েছে। চলো, আমরা ক্যাপ্টেন মজুমদারের কাছে যাই। আমার সমবয়সী বন্ধু।'

ক্যাপটেন মজুমদারের একখানা চেহারা বটে। আর্মিতে ছিলেন বোঝাই যায়। ক্রু-কাট চুল। সে আবার কি ! জ্যাঠামশাই চুল কাটার সময় নানা ছাঁটের কথা বলেন। আমি শুনে শিখেছি। মাথার চারপাশ হোলসেল কামানো। মাঝখানে একেবারে টুথব্রাশ। দেখলে হাসিই পায়। ইচ্ছে করে নিজের মাথাটাকে কেউ এমন করে ! কিন্তু করে। ক্যাপটেন মজুমদারের গোঁফ জোড়াও সেইরকম। এপাশে, ওপাশে দুপাশে শুঁড়ের মতো বেরিয়ে আছে। লোহার মতো পেটানো শরীর।

'মাস্টারমশাই আপনি ?' বললেন, যেন বোমা ফাটল।

মাস্টারমশাই বললেন, 'হ্যাঁ আমি। কোনো অসুবিধে আছে ?'

'না, অসুবিধে কিসের ? তবে আপনার তো কখনো অসুখ করে না !'

'করেও নি। অসুখ করেছে আমার এই ছাত্রটির।'

'দেখেই বুঝেছি। অসুখের ডিপো। ওই কয়লার ডিপো, কেরোসিনের ডিপোর মতো। ওর তো টনসিল ! পুরোপুরি টনসিলের চেহারা। নার্ভেরও গোলমাল আছে।'

'টনসিলটা হয়তো ঠিক বলেছ, এইটুকু ছেলের আবার নার্ভ কি ?'

'জিজ্ঞেস করুন, ও ভীষণ নার্ভাস। খোকা, তুমি আরশোলা দেখলে

দৌড়োও না ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, একবার এমন দৌড়েছিলুম বারান্দা থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলুম আমাদের একতলার কলঘরের ছাতে।'

'আহা বেরিয়ে কেন বলছ ? বলো রেলিং ভেঙে।'

'আজ্ঞে, তাই হয় তো হবে।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'মাস্টারমশাই আপনার এই ছাত্রটি বড় উকিল হবে।'

'আমারও সেইরকমই ধারণা। এই বয়সেই যে-সব প্যাঁচ মারে, সাঙ্ঘাতিক। আমিই হেরে যাই। আচ্ছা ! তুমি এইবার দেখো। আমার সময় খুব কম।'

ডাক্তারবাবু ডাকলেন আমাকে, 'কাছে এসো, হাতের নাগালের মধ্যে এসো।'

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম। একটানে আমার মাফলারটা খুলে ফেললেন, 'এসব কি জড়িয়ে বসে আছ ? ছাগল নাকি !'

কলার মতো মোটা মোটা আঙুল দিয়ে, নিচের চোয়ালে গলার কাছে খোঁচা মারতে লাগলেন আর প্রশ্ন করলেন, 'লাগে, লাগে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'লাগবেই তো। লাগার জন্যেই তো খোঁচাচ্ছি। বেশ ভালই। গ্ল্যাণ্ডের আড়ত। করেছ কি ? এই বয়সেই এত, বুড়ো বয়েসে তো মা কালীর মুণ্ডমালার মতো হবে। ইস্, শরীরটাকে একেবারে ড্যামেজ করে ফেলেছ হে। দেখি হাঁ করো। অমন পুঁচকে হাঁ নয়, জলহস্তীর মতো।'

তাই করলুম। ভাগ্যিস চিড়িয়াখানায় জলহস্তী দেখা ছিল !

ডাক্তারবাবু বললেন, 'গুড, ভেরি গুড। আ করো। সা আ।'

'সা আ।'

'আরো জোরে—সা আ।'

'সা আ।'

'আরে বাপরে ! গলার দু'পাশে দুটো ভোজপুরী দারোয়ান। যাও বোসো।'

চেয়ারে বসলুম। সা আ করতে বেশ মজা লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আবার করি। অনবরত করি।

মাস্টারমশাই বললেন, 'উপায় ?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'কিছু না। একমাত্র উপায় ছুরি। ধরো আর কচাত করে কেটে ফেলে দাও।'

'কাটাকাটি চলবে না। অন্য কিছু ভাবো।'

'অন্য কিছু ভাবার নেই মাস্টারমশাই।'

'আমি সেদিন একটা মেডিকেল জার্নালে পড়লুম, টনসিল হল গলার প্রহরী। তারও প্রয়োজন আছে। জার্মস আটকায়, কাটাটা ঠিক নয়। শরীরের ক্ষতি হয়। অন্য অসুখের আক্রমণ বাড়ে। বিদেশে আর কথায় কথায় টনসিল কাটে না।'

'ঠিক বলেছেন মাস্টারমশাই। তবে সেপ্‌টিক টনসিল থেকে চোখ খারাপ হতে পারে, বাত হতে পারে। আপাতত একটা কাজ করি, একটা লোশান তৈরি করে দি। সকাল-সন্ধে তুলি দিয়ে লাগাক। আর একটা কথা বলি, যোগাসনে অনেক সময় উপকার হয়। আর হয় সাঁতারে। টনসিলের আর একটা মজা হল বয়েস বাড়লে সেরে যায়।'

ওষুধের শিশিটা নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলুম। মাস্টারমশাই বললেন, 'মিলিটারি ডাক্তার তো, ছোরাছুরি ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না। তোমাকে আমি আসন করাবো আর সাঁতার কাটা শেখাবো।'

বাড়িতে পেঁছে দিয়ে মাস্টারমশাই চলে গেলেন। মা বললেন, 'ছেলেবেলায় আমার খুব কাশির ধাত ছিল।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'তোর কি ছিল না উমা! কাশির ধাত, পেট খারাপের ধাত, স্বপ্ন দেখার ধাত। সব তোর ছেলে পেয়েছে।'

মা বললেন, 'যাদের টনসিল থাকে তারা গাইয়ে হয়। শিল্পী হয়।'

সেই কারণেই ডাক্তারবাবু আমাকে সা আ, সা আ করালেন। ওই করতে করতেই গাইয়ে হয়ে যাবো। ডাক্তারবাবুর দেওয়া সেই লোশানটার রঙ লালচে। আমার মা আমার মতোই ছেলেমানুষ। কোনো কিছুতেই তর সয় না। সঙ্গে সঙ্গে কাঠির মাথায় জড়ানো হয়ে গেল তুলো, তৈরি হয়ে গেল তুলি। বারান্দার চড়চড়ে রোদের আলোয় টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'হাঁ কর।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'উমা, কাশি এখন কম আছে। এখনই কেন থ্রোট পেন্ট লাগাচ্ছিস!'

'লাগিয়ে দেখি না কি হয়!'

যা হল সে আর বলার নয়। গলায় ওষুধ লাগানো তুলি ঢোকা মাত্রই, মা বোধহয় একবার বুলিয়েছেন, পেটে যা ছিল সব ঠেলে উঠতে চাইল মুখে। কোনো রকমে সামলে বসে পড়লুম। মা তুলি ফেলে দৌড়। জ্যাঠাইমা বললেন, 'কি হল রে উমা !'

মা বললেন, 'খুব বাঁচা বেঁচে গেছি ! কি রকম একটা শব্দ করে কামড়াতে আসছিল ভাই।'

জ্যাঠাইমা সুন্দর গান গাইতে পারেন। গান ধরলেন :

একদা এক বাঘের গলায়
হাড় ফুটিয়াছিল
এমন সময় বাঘামামা
বার করলে তার বুদ্ধির ধামা
শেষে কোস্তাকুস্তি ধস্তাধস্তি
প্যাঁ অ্যাঁক করে হাড় বেরিয়ে গেল ॥

বাড়িতে যখন পুরুষরা কেউ থাকেন না, দুই বোনের খুব মজা। কোরাসে গান। মাঝে মাঝে নাচ। চোর চোর খেলা। সব ছেড়ে বাগানে গিয়ে পিকনিক। গাছে গাছে কাপড় বেঁধে তাঁবু তৈরি করে স্টোভ জেবলে টুকটাক কিছু রান্না। আলুর দম, আলুকাবলি, ছোলার ঘুগনি, ছোটো ছোটো ফুলকো লুচি। কখনো শুধুই ঝাল ঝাল ডাঁটা চচ্চড়ি। খাওয়াটা বড় কথা নয়, বড় হল পরিবেশ। গাছ, পাখি, লতা, ঝুমকো ফুল, ঘাস। মাটির সঙ্গে সমান সমান বাঁধানো বড় চৌবাচ্চা, সেই চৌবাচ্চায় পদ্মফুল করেছেন বাবা।

চারপাশে বেঁচে থাকার এত আনন্দ ! তার মাঝে একটুই নিরানন্দ, যত রাত বাড়ে, ততই বাড়ে আমার কাশি।

পাঁচ

আমাদের স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশান। খুব ঘটা করে হয়। বিশাল প্যাণ্ডেল। এককালের বিখ্যাত জমিদার, পরে মন্ত্রী, রায়চৌধুরীমশাই সভাপতি। সাংঘাতিক ভারিক্কি চেহারা। চওড়া গোঁপ। মাঝখানে সিঁথে। দু'পাশে দু'ভাগ করা চুল। ফিনফিনে খদ্দরের পাঞ্জাবি। চওড়া

পাড় কোঁচানো ধুতি। চোখে চশমা। কথা খুব কম বলেন। দেখলেই ভয় করে। বিশাল সভা। অভিভাবক, ছাত্র, প্রাক্তন ছাত্র, গিজগিজ করছে চারপাশ। হেডমাস্টারমশাই তাল রাখতে পারছেন না। এদিক ছুটছেন, ওদিক ছুটছেন। স্কুলের সেক্রেটারি বিখ্যাত ব্যারিস্টার। অন্যদিন সায়েবী পোশাক, অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিপাট বাঙালী। মঞ্চে সভাপতির পাশে বসে আছেন। মেজাজের লড়াই চলেছে। কে কতটা গম্ভীর হতে পারেন, তার প্রতিযোগিতা। টেবিলের দু'পাশে দুটো বিশাল ফুলদানি। থেকে থেকেই উল্টে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সভাস্থ সকলে গেল, গেল করে উঠছেন। গেম টিচার নরেশবাবু শেষ মুহূর্তে বাঁচিয়ে দিচ্ছেন প্রতিবারই।

ব্যারিস্টার সেক্রেটারি এক সময় বলেই ফেললেন, 'টপ হেভি।'

জমিদারমশাই মানবেন কেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বটম লাইট।'

অঙ্কের স্যার পাশেই ছিলেন, বললেন, 'দুটোই এক।'

অঙ্কের শিক্ষক কুমুদবাবুও রাশভারি মানুষ। তেমনি অহঙ্কার। পৃথিবীর যত অঙ্ক সব মুখে মুখে কষে ফেলতে পারেন। তাঁর চোখে আমরা ছাত্ররা সব দ্বিপদ গাধা। মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলেন, 'তোদের বাপমায়ের কথা ভেবে আমার চোখ ফেটে জল আসে। তাঁরা হয়তো তোদের মানুষ ভেবেই খাওয়াচ্ছেন, পরাচ্ছেন। ছেলে আমার বিলেত যাবে। এদিকে দুই আর দুয়ে কত? চুলকে চুলকে মাথার সব চুল উঠে গেল।'

আমাদের যে-ভাবে প্রায়ই ঘাড় ধরে ক্লাস থেকে বের করে দেন, সেই ভাবে দু'হাতে ফুলদানিদুটোর গলা ধরে টেবিল থেকে নামিয়ে দিলেন। সভায় হাততালি পড়ে গেল। অভিভাবকরা বলে উঠলেন, 'ওয়েল ডান, ওয়েল ডান।'

সামনের সারিতে নিচু ক্লাসের ছেলেরা, তারা হোও করে উঠতেই, পণ্ডিতমশাই ঠাঁই ঠাস, ঠাঁই ঠাস করে পালের গোদাদের পিটিয়ে দিলেন। সবাই অমনি চিৎকার করলেন, 'পিস, পিস। শান্তি, শান্তি।'

হেডমাস্টারমশাই উইংসের কাছে গিয়ে কাকে বললেন, 'ঘাড় ধরে ওটাকে একেবারে বাইরে বের করে দিয়ে এসো। সব কটা বাঁদরকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে এসো। সব লুচি আলুর দম চুরি করে মেরে দিলে। আমার এত আর্টিস্ট, তাদের মুখে আমি কি দোবো! আমার স্কুলটা

চোরে ভরে গেল। স্কুলের বদলে এইবার এটাকে থানা করে দিলেই হয়। আমি হেডমাস্টার না, থানার বড় দারোগা!'

উইংসের কাছ থেকে মাইকের সামনে সরে এলেন। হাতে একটা কাগজ। মাইকের সামনে বার কতক টুসকি মারলেন। মেরেই বললেন, 'ভল্যুম, ভল্যুম।'

সঙ্গে সঙ্গে সামনের আসনের এক গাদা কুঁচো চিৎকার করে উঠল, 'ভল্যুম, ভল্যুম।'

পণ্ডিতমশাই তেড়ে এলেন, 'অ্যায়, চপ্ চপ্।'

এক ডেঁপো কোথা থেকে বলে উঠল, 'কোথায় আলুর চপ স্যার।'

প্রেসিডেন্ট রায়চৌধুরী, ব্যঙ্গের হাসি হেসে হেডমাস্টারমশাইকে বললেন, 'আপনার স্কুলের ডিসিপ্লিন একেবারে ভেঙে পড়েছে। আর কোনোমতেই স্কুল বলা যায় না। মোর এ গাব্বা হাউস, দ্যান এ স্কুল।'

লজ্জায়, অপমানে হেডমাস্টারমশাইয়ের মুখ একেবারে লাল হয়ে গেল।

ব্যারিস্টার সেক্রেটারি বললেন, 'ভালমানুষের যুগ শেষ হয়ে গেছে। আমাদের হেডমাস্টার, আওয়ার হেডমাস্টার ইজ এ সেন্টলি ম্যান। ওঁর স্থান হওয়া উচিত আশ্রমে। আমাদের এখানে টেগার্ট সায়েবের মতো জাঁদরেল একজন মানুষ দরকার।'

হেডমাস্টারমশাই আর কোনো কথায় কান না দিয়ে ঘোষণা শুরু করলেন। সকলকে স্বাগত জানালেন। রায়চৌধুরীমশাই ও অন্যান্য মহামান্য, অভিভাবক ও প্রিয় ছাত্ররা সমবেত হয়েছেন, এর জন্যে প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি সকলের কাছে অসীম কৃতজ্ঞ।

এখন উদ্বোধন সংগীত। নবম শ্রেণীর ছাত্ররা পরিবেশন করবে।

প্যাঁক্ করে বেজে উঠল হারমোনিয়াম। হারমোনিয়ামের বেলোতে ছেঁদা। অনেকবার ভটাস ভটাস করে বেলো করলে, তবেই প্যাঁক করে একবার শব্দ বোরায়; যেন হাঁসের পেট টেপা হল। ক্লাস নাইনের পরেশ অনেকক্ষণ প্যাঁক প্যাঁক করছে, গান আর ধরছে না।

তখন পেছনের আসন থেকে কে একজন হাঁক মারল, 'অনেকক্ষণ প্যাঁক প্যাঁক করছ এইবার ডিমটা পেড়ে ফেল।'

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হাসি।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, 'সাইলেন্স, সাইলেন্স,। চুপ, একদম চুপ।'

পরেশ গলা সাধা শুরু করল, সা, রে, গা, মা—

হেডমাস্টারমশাই আর পারলেন না, অবাক হয়ে বললেন, 'হোয়াট ইজ্ দিস। এটা কি হচ্ছে?'

আমাদের সঙ্গীতশিক্ষক নিত্যানন্দবাবু পাশেই ছিলেন, তিনি বললেন, 'গলাটা একটু চৌরস করে নিক স্যার, তা না হলে চড়ার দিকে দেবে যাবে।'

প্রেসিডেণ্ট মশাই বললেন, 'গলা কি রাস্তা। রোলার চালাতে হবে!'

পরেশ কালবিলম্ব না করে ধরে ফেলল। যেন পড়ে যাচ্ছিল খপ করে কার্নিশ ধরে ফেলেছে।

অ্যায় আগুনের পরোশমণি ছুঁয়াও প্রাণে
অ্যা জীবোন পূর্ণ করো দহোন-দানে॥
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো

প্রেসিডেন্ট সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ঘুষি পাকিয়ে বললেন, 'রামাধর ইসকো উঠাকে বাহার ফেকদো। গান গাইছে গান! উদ্বোধন না উদ্বন্ধন সঙ্গীত। যেন গরুর লেজ মলছে গাড়োয়ান। অ্যায় জানোয়ার কাম হিয়ার।'

পরেশ পায়ে পায়ে এগিয়ে এল।

'কান ধর।'

পরেশ ইতস্তত করছে। জমিদারী মেজাজে এক ধমক,

'কান পাকড়ো।'

পরেশ কাঁপা কাঁপা হাতে কান ধরল।

'দর্শকদের দিকে ফের।'

পরেশ তাই করল।

'বল, জীবনে আমি আর কখনো গান গাইবার চেষ্টা করব না।'

পরেশ কেঁদে ফেলেছে, 'জীবনে, আমি আর কখনো গান গাইবার চেষ্টা করব না।'

'যাও। একেবারে ত্রিসীমানা ছেড়ে চলে যাও।'

সঙ্গীতশিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা কি রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। অ্যায়, আগুনের পরোশমণি? অ্যায় কোথায় পেলেন?'

'আজ্ঞে ওটা একস্ট্রা, ধরতাই হিসেবে ফিট করে দিয়েছিলুম।'

'রবীন্দ্রসঙ্গীত চেয়ার না আলমারি! হাতল ফিট করছেন? আপনি সঙ্গীতশিক্ষক না ছুতোর। পরোওশমণি? পাপোষ। গেট আউট।

এক্ষুণি বেরিয়ে যান। ক্লিয়ার আউট। ক্লিয়ার আউট।'

ছেলেরা আবার চিৎকার ছাড়ল, 'ইসকো উঠাকে বাহার ফেঁক দো।'

সৌম্য চেহারার এক অভিভাবক মাঝসারি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সাংস্কৃতিক ব্যাপারটা বন্ধ করে কাজের কাজে আসুন। বিজনেস অফ দি মিটিং।'

প্রেসিডেন্টমশাই এক কালের জমিদার। একস্ জমিন্দার। অন্যের নির্দেশে চলবেন! অভিজাত হাসিতে মুখ ভরে গেল। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা লিমিটেড কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং নয়। হিতকারী সভার কমিটি মিটিং নয়। দিস ইজ অ্যান এডুকেশানাল ইন্সস্টিটট্যুশান। সিট অফ লারনিং। হোয়্যার ইজ পণ্ডিত-মশাই। পণ্ডিতমশাই কোথায়!'

একজন বললেন, 'এই তো এখানে ছিলেন। বেত হাতে ছেলেদের ঠ্যাঙাচ্ছিলেন।'

আর একজন বললেন, 'মনে হয় পান খেতে গেছেন।'

হঠাৎ যেন কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার হল, 'এই তো পণ্ডিত-মশাই। এখানে ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

প্রেসিডেন্ট মশাই একটু বাঁকা গলায় বললেন, 'সবাই মিলে উৎপাটন করে নিয়ে আসুন। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে নিদ্রার ঘনিষ্ঠ সংযোগ।'

পণ্ডিতমশাইয়ের কাঁচা ঘুম ভেঙেছে। তিনি হকচকানো মুখে মঞ্চে উঠলেন। হাতজোড় করে প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে বললেন, 'আমাকে যে প্রয়োজন হতে পারে, এ আমি বুঝিনি।'

'আপনাকেই তো প্রয়োজন। যান উদ্বোধন করুন।'

'আজ্ঞে কি উদ্বোধন। সম্যক অধিগম্য হল না।'

'এই সভার উদ্বোধন। সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করুন। যান, মাইকের সামনে।'

'অনুমতি করুন আমি তাহলে শাস্ত্রীয় বেশ ধারণ করে আসি।'

'কোনো প্রয়োজন নেই। বেশ আপনার চমৎকার আছে। একেবারে শাস্ত্রসম্মত।'

মাইক্রোফোনের সামনে পণ্ডিতমশাই চোখ বুজিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সভায় সবাই ফিসফিস করছেন, 'আজ পণ্ডিতমশাইয়ের হয়ে গেল। জীবনে কখনো মাইকের সামনে দাঁড়াননি। নরঃ নরৌ, নরাঃ

করেছেন ক্লাসে। আর ডাস্টার পেটা। আজ পড়েছেন ফাঁপরে।'

'ওঁ।'

এক ওঙ্কার ধ্বনিতে সভা কেঁপে উঠল। ভরাট গলা তেমনি সুর। পণ্ডিতমশাইয়ের চেহারা পাল্টে গেল। শরীরে একটা জ্যোতি খেলছে। সভা একেবরে নিস্তব্ধ। সামনের সারির কুঁচোগুলোও চুপ। পণ্ডিত-মশাই হাত জোড় করে অপূর্ব সুরে পাঠ করছেন :

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।

যৎকৃপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈর্বেদৈঃ ।

সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।

দীর্ঘ স্তব। প্রেসিডেন্টমশাই অবাক। হেডমাস্টারমশাই স্তম্ভিত। পাশেই গঙ্গা। হু হু বাতাসে সুরে উড়ে যাচ্ছে। কেউ জানত না, পণ্ডিতমশাইয়ের এত সুন্দর গলা, সুরের ওপর এত দখল! আগুনের ফুলকির মতো উচ্চারণ।

পণ্ডিতমশাই শেষ করছেন ঃ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

পণ্ডিতমশাই যেই শেষ করলেন, সভা একেবারে ফেটে পড়ল, 'সাধু, সাধু।'

প্রেসিডেন্টমশাই উঠে নিজের গলার পাট করার সিল্কের চাদর পণ্ডিতমশাইয়ের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'অপূর্ব, অপূর্ব! আপনি আমাকে মোহিত করেছেন।' সভার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই ঋষিকে আমি দু'কাঠা দশ ছটাক জমি দান করলুম।'

সভা আবার চিৎকার করে উঠল, 'সাধু, সাধু।'

পণ্ডিতমশাই চলে যাচ্ছিলেন। প্রেসিডেন্টমশাই বললেন, 'না, না, আপনি মঞ্চে বসুন।'

সভার সুরটাই পাল্টে দিলেন পণ্ডিতমশাই। এর পরেই শুরু হল সেই বিশ্রী ব্যাপার। সেক্রেটারি ইংরেজিতে পড়তে লাগলেন বাৎসরিক রিপোর্ট। সে আর শেষ হয় না। হাঁউ হাঁউ করে সব হাই তুলছেন। কেউ আবার বলছেন, 'ওরে বাবা। আর পারি না।'

এক ঘণ্টা পনের মিনিট। সেক্রেটারি বসলেন। ডাক পড়ল আমার।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি। এতক্ষণ বেশ বসেছিলুম। কোনো কাশিটাশি ছিল না, শুরু হল গলা খুশখুশ। মঞ্চে ওঠার আগে কচমচ করে একটা লবঙ্গ চিবোলুম। ভীষণ ঝাল। নমস্কার করে শুরু করলুম, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, খুক্, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, খুক্খুক্।

আজি এ প্রভাতে রবির কর খ্যাঁক্
কেমনে পশিল প্রাণের' পর, কোঁক
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে ঘকঘক
প্রভাতে পাখির গান, খক্ খকর খক্ খক্
খক্ খক্॥

প্রেসিডেন্টমশাই বলছেন, 'এটা কি রবীন্দ্রনাথের কোনো স্পেস্যাল কবিতা ?'

হেডমাস্টারমশাই বলছেন, 'ছেলেটি ভাল আবৃত্তি করে। খুব কাশি হয়েছে।'

আমি বেশ একটু ভাব দিয়ে গলাটাকে টেনে বলতে গেলুম :

না জানি কেন রে এতদিন পরে
খক্ খক্ খুক্ খক্ খাক্ খাক্ খাক্।

প্রেসিডেন্টমশাই ভয়ঙ্কর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমাকে আর জানতে হবে না, আমরা তোমার কাশি শুনতে আসিনি। দয়া করে বিদায় হও।'

সভায় চিৎকার উঠল, 'এতক্ষণ আপনাদের কেশে শোনাল ...'

লজ্জায় অপমানে সোজা বাড়ি। আমারও পুরস্কার ছিল। সে সব ফেলেই চলে এলুম। জ্যাঠাইমার বুকে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ কাঁদলুম। জ্যাঠাইমা বললেন, 'আশ্চর্য কাশি! কিছুতেই কমে না।' আমার এই অপমান যেন সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। সবাই বিষণ্ণ হয়ে বসে রইলেন রাত বারোটা পর্যন্ত।

ছয়

কাশিটাশি সব মাথায় উঠে গেল। জ্যাঠামশাই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমাদের পরিবারে কেন, আমাদের পাড়ায়, আমাদের গ্রামে জ্যাঠামশাইয়ের মতো সুন্দর মানুষ, প্রিয় মানুষ আর দ্বিতীয় ছিলেন

কি না সন্দেহ ! সকলের ভালবাসার মানুষ। নিজের জীবন দিয়ে অন্যের উপকার করেন। জ্যাঠামশাই যেখানে, সেখানেই জমজমাট পরিবেশ। গান, গল্প, হাসি, খাওয়াদাওয়া। চলে গেলেই সব শূন্য।

অল্প অল্প জ্বর আসে সন্ধ্যের দিকে। ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছেন। অসুখটা ঠিক ধরা যাচ্ছে না। ডাক্তারবাবুরা দেখছেন। বড় বড় প্রেসক্রিপসান। ওষুধের ছড়াছড়ি। বাবার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। মায়ের নাচ, জ্যাঠাইমার গান আর হয় না। দাদু ঠাকুরঘরে ঢুকলে আর বেরোতে চান না। মূর্তির মধ্যে যে-ভগবান তাঁকে শোনাতে চান দুঃখের কথা। মানুষ ডাক্তার যা পারেন না, কেঁদে কেঁদে ভগবানের কাছে তাই প্রার্থনা করেন। জ্যাঠামশাইয়ের আরোগ্য।

বাড়ির সুর কেটে গেল। আমি খক্ খক্ কাশি, সে-কাশি কেউ শুনেও শোনে না। মাস্টারমশাই আসেন, পড়িয়ে চলে যান। আমি স্কুলে যাই। স্কুলের মাঠের বিশাল শিশুগাছ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকি। তোমরা কত বড় হলে। কত দিন বেঁচে আছ, আরো কত দিন থাকবে ! মানুষ কেন পারে না। মানুষ কেন হেরে যায়। কেন মানুষের অসুখ করে। তোমাদের তো অসুখ করে না। গাছের বিশাল গুঁড়ি বেয়ে পিঁপড়ের ওঠা-নামা দেখি। উঁচু উঁচু ডালে টিয়ার ঝাঁক। পশ্চিমের সূর্য গঙ্গার ওপারে নেমে যায় সোনার থালার মতো। কখনো সাদা, কখনো নীল পাল তুলে বড় বড় নৌকো চলে যায় এক দেশ থেকে আর এক দেশে। ভরা গঙ্গার জল ঘাটের পৈঠায় ছলাত ছলাত করে। শ্মশানের কাঠকয়লা ভেসে আসে। সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে আমি কেঁদে ফেলি। বেলুড় মঠের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বলি, ভগবান রামকৃষ্ণ, আমার জ্যাঠামশাইকে সুস্থ করে দিন।

সবাই বললেন, এই অসুখটার নাম কনসাম্পসান। শরীর ক্ষয়ে যাচ্ছে। অসুখটা ধরেছে লাংসে। একবার চেঞ্জে নিয়ে গিয়ে দেখা যেতে পারে। বেশ শুকনো কোনো পাহাড়ী জায়গায়। যেখানে বাতাসে ইউক্যালিপ্টাসের গন্ধ। জলে ধাতুচূর্ণ। হজমীর কাজ করবে। অল্প অল্প বেড়ানো, ভাল খাওয়া। আর বিশ্রাম।

হাজারিবাগ রোড স্টেশানে আমাদের সম্পর্কে এক কাকা থাকেন। সুন্দর বাগানবাড়ি। জায়গাটাও খুব স্বাস্থ্যকর। ঠিক হল, দাদু আমি

জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমা যাবেন। আর যাবে এক শক্ত চেহারার যুবক। তার নাম প্রফুল্ল। জ্যাঠামশাই তাকে চাকরি করে দিয়েছিলেন। ধরা-বাঁধার চাকরি তার ভাল লাগেনি। ছেড়ে দিয়েছে। আমাকে বলেছিল, দুপুরের মেঘ-ভাসা নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, হাঁস-ভাসা পুকুর, গাছের ডালে ডালে পাখির ডাক ছেড়ে, সারাটা দিন কারখানায় বসে থাকতে ভাল লাগে? আমি তার সঙ্গে একেবারে এক মত। পেটের জন্যেই চাকরি। পেটটা কত বড়, যে তার জন্যে সব ছেড়ে দিতে হবে!

রাত নটার ট্রেনে আমরা উঠে বসলুম। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে জ্যাঠামশাই গোটা বাড়িটা একবার ঘুরে ঘুরে দেখে নিলেন। ছাতে গিয়ে টবের সব ফুলগাছের সঙ্গে কথা বললেন। ঘরের কোণে তিন জোড়া মাছ ধরার ছিপ। তাঁর বড় প্রাণের জিনিস। মাছ ধরার ভীষণ নেশা। ছিপগুলোকে বললেন, লক্ষ্মী হয়ে থাকো। ফিরে এসে মাছের সঙ্গে খেলা করতে নিয়ে যাবো। জ্যাঠামশাইয়ের বুকে মাথা রেখে মা কাঁদছিলেন। মায়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জ্যাঠামশাই বলছেন, 'পাগলী মেয়ে, আমি কি একেবারে চলে যাচ্ছি। এক মাস পরে তোমরা সবাই যাবে। এবারের পুজো আমরা বিহারে দেখবো।'

বলতে বলতে, জ্যাঠামশাইয়ের চোখেও জল এসে গেল। কাজের মহিলাটির হাতে একশো টাকার একটা নোট দিয়ে বললেন, 'ছেলের অসুখ, ভাল করে চিকিৎসা করাও।'

সে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। পাড়ার প্রায় সবাই এসে দাঁড়ালেন ভিড় করে। সকলের চোখেই ছলছলে জল। আমার জ্যাঠামশাই বিদেশে যাচ্ছেন।

আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল। বাবা, আরো অনেকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। ক্রমশই তাঁরা ছোট হয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ প্ল্যাটফর্ম শেষ। রেল ইয়ার্ড, লোহালক্কড়, এখানে ওখানে কেন্নোর মতো গাড়ি। রেলের কেবিন। সিগন্যাল ঘর। সব পেছন দিকে ছুটছে। হঠাৎ ফাঁকা মাঠ। আকাশে একটা ঘোলের মতো চাঁদ। ট্রেনের ঘুমপাড়ানি শব্দ। জ্যাঠামশাই শুয়ে পড়লেন। পুরো একটা ক্যুপ রিজার্ভ করে আমরা চলেছি। আমার পাশে দাদু। জ্যাঠাইমার কোলে জ্যাঠামশাইয়ের পা দুটো। আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি জানালার বাইরে। পৃথিবীটা কি বিশাল আর কত সুন্দর! স্বপ্নের মতো রাত। নির্জন গ্রাম। ঘুম-

ঘুম স্টেশান ! ট্রেন চলেছে ।

প্রায় দুপুরবেলা খরখরে রোদে আমরা হাজারিবাগ স্টেশানে এসে নামলুম। প্রফুল্লদা একাই একশো। ঝপাঝপ মালপত্র সব নামিয়ে ফেলল। বুক চিতিয়ে বললে, 'ওয়াণ্ডারফুল জায়গা। সরু তারের মতো বাতাস।' জ্যাঠামশাই একটা বেঞ্চিতে বসতে গিয়ে লাফিয়ে উঠলেন। চাটুর মতো গরম। দাদু বিশাল ছাতাটা জ্যাঠামশাইয়ের মাথার ওপর মেলে ধরলেন। আমার টুকটুকে ফর্সা জ্যাঠাইমা সিল্কের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছেন। বাতাসে চুল উড়ছে। আঁচল উড়ছে। রঙ যেন জ্বলছে।

হঠাৎ ওভারব্রিজে বেশ মোটাসোটা এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। সাদা ট্রাউজার, সাদা হাফশার্ট, মাথায় শোলার হ্যাট। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'চলে আসুন, চলে আসুন, বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।' সেই অত উঁচুতে রোদের আকাশ মাথায় দিয়ে রাজহাঁসের মতো এক মানুষ। তলায় এক জোড়া ইস্পাতের লাইন। রোদে ঝলমল করছে।

জ্যাঠামশাইয়ের এক হাত আমার কাঁধে, আর এক হাতে ছাতা। ছাতার ওপর ভর রেখে সিঁড়ি ভাঙছেন। বিশাল উঁচু ওভারব্রিজ। অনেক সিঁড়ি। জ্যাঠামশাইয়ের উঠতে কষ্ট হচ্ছে। আমার ছাড়া আর কারোর সাহায্য নেবেন না। প্রফুল্লদা এগিয়ে এসেছিল। জ্যাঠামশাই বললেন, 'তুই মোটঘাট সামলা।' জ্যাঠাইমা দাদুকে সাহায্য করছেন।

আমাদের কাকাবাবুর মটরগাড়িটা বেশ সুন্দর। মাথার হুডটা ক্যানভাসের। দু'পাশে পাদানি। সামনে স্টিয়ারিং-এর ডানদিকে চোঙা লাগানো একটা বিশাল হর্ন। চারটে বড় বড় চাকা। চকচকে চকোলেট রঙ। বেশ বড় গাড়ি। আসন বেশ চওড়া। হাঁটু রাখার অনেক জায়গা। দরজা ছোট ছোট। পুরোটা খুলে যায়। ঢুকতে অসুবিধে হয় না। ভেতরটা বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। সুন্দর একটা গন্ধ।

কাকাবাবু আমাদের জন্যে বেশ একটা ভালো বাগানবাড়ি ঠিক করেছিলেন। আমি আর প্রফুল্লদা সামনে বসেছি। কাকাবাবু গাড়ি চালাচ্ছেন। সোজা লম্বা রাস্তা। খাঁ খাঁ রোদ। কোনো লোকজন নেই। তবু কাকাবাবু মাঝে মাঝে হর্ন বাজাচ্ছেন ভ্যাঁক ভ্যাঁক করে। হাসি খুশি মজার মানুষ। বলছেন, 'মাঝে মাঝে হর্ন না বাজালে গাড়ি বলে বোঝা যাবে কি করে ! গরু যদি না ডাকে, আর গাড়ি যদি হর্ন না দেয় তাহলে

কি মানায় !'

বাগানবাড়িটার নাম খুব সুন্দর, 'ফুলের জলসা'। সত্যিই তাই। তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো বাগান। জ্যাঠামশাই বাগান, ফুল, পুকুর কত ভালবাসেন! শরীর কত ক্লান্ত, যে একবার মাত্র থমকে দাঁড়িয়ে একবারই বাঃ বললেন। কাকাবাবুকে বললেন, 'শরৎ, বাড়িটা তুমি বড় ভাল ঠিক করেছ। এর আগের বার আমরা যখন এসেছিলুম, তখন তো এই বাড়িটা ছিল না।'

'মেজদা এটা আমার হাতে তৈরি। কলকাতার এক ব্যারিস্টারের। কত খরচ করে করলে, একবারও আসে না। কেবল শুনি বিলেত গেছে। আচ্ছা, ভেতরে সব ছবির মতো করা আছে। কোনো কিছুর অভাব নেই। সাহায্য করার জন্যে একটি মেয়ে আছে। সুন্দর নাম, সুর্মা। আমি এখন একবার আমার কাজের সাইটে যাবো। রাত্তিরে আসব।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'এত বেলা হল। খেয়ে যাবেন না।'

'বউদি, ব্যাচেলার মানুষ আমি। আমার সকালের দিকের খাওয়া টুকটাক। কন্ট্রাক্টার সকালে বেশি খেলে ব্যবসা লাটে উঠে যাবে বউদি। রাত্তিরে খাবো। আমি পাম নদীর দিকে যাচ্ছি। আসার সময় ভেটকি নিয়ে আসবো। দেখবেন কি টেস্ট !'

তিনবার হর্ন বাজিয়ে শরৎকাকুর গাড়ি চলে গেল। দুপুরের রোদে ঝিম মেরে জলসা করছে হরেক রকমের গোলাপ। ফর ফর করে কাগজের টুকরোর মতো উড়ছে নানা রঙের প্রজাপতি। সাদা রঙ করা ইটের কেয়ারি। সাদা নুড়ি বিছানো চওড়া পথ। প্রফুল্লদা বললে, 'তোমাকে বলছি, এতদিনে আমি আমার মনের মতো একটা দেশ খুঁজে পেয়েছি। এ ছেড়ে আমি আর যাচ্ছি না। তোমরা যখন ফিরবে, তোমাদের আমি ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবো। এই তো আমার স্বর্গ !'

হাজারিবাগে সেই ফুলের জলসায় আমরা তিন মাস ছিলুম। বড় বড় ঘর। কুচকুচে কালো স্লেট পাথরের মেঝে। বিশাল ঘেরা বারান্দা চারপাশে। বারান্দায় বারান্দায় বেতের সোফাসেট। আর্ম চেয়ার। ইজি চেয়ার। সামনে ফুল। পেছনে ফুল আর ফল। বাগানে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হলে বসার জন্যে সিমেন্ট বাঁধানো গোল গোল বেদী। রোজ সকালে একজন মালী এসে গাছের পরিচর্যা করে যায়। আমাদের

সঙ্গে ভীষণ ভাব হয়ে গিয়েছিল।

সাত দিনের মধ্যেই জ্যাঠামশাইয়ের শরীরে বেশ জোর ফিরে এল। ফ্যাকাশে রঙে লাগল লালের আভা। দাদু আমাকে ফিসফিস করে বললেন, 'থ্যাঙ্ক গড। শরীরে রক্ত লাগছে। বলতে নেই তোমার চেহারাও বেশ ইমপ্রুভ করেছে। তোমার কাশি কোথায় গেল?'

'আর খুঁজে পাচ্ছি না।'

'ব্যাটা পালিয়েছে।'

সে কি আনন্দের দিন। আট দিনের মাথায় আমাদের ভোরে বেড়ানো শুরু হল। ভোরের আকাশে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লদার প্রাইমাস স্টোভের সাঁ সাঁ শব্দ। দাদুর স্তোত্রপাঠ। চা তৈরি হতে হতেই আমাদের সাজগোজ শেষ।

ফুটফুটে সকাল। সার সার ইউক্যালিপটাস আর দেবদারু খাড়া উঠে গেছে আকাশের দিকে। আকাশের রঙ গা ধোয়া নীল। পাথর ছড়ানো পথে আমরা হাঁটছি। কোনো তাড়া নেই, উদ্বেগ নেই, উৎকণ্ঠা নেই। চামরের মতো বাতাস। কত রকমের গল্প, গান, প্রফুল্লদাকে নিয়ে দাদুর মজা। জ্যাঠাইমার নরম হাত আমার হাতে। যেন সুখের পাল্কি চলেছে।

হাটের দিনে আমরা হাট ঘুরে বাড়ি ফিরে আসতুম। সঙ্গে বিশাল সওদা। আসার পথে হালুইকরের দোকানে একটা হল্ট। অপূর্ব কচুরি, মোহনভোগ, বালুসাই, দুধঘন চা। দুপুরে আমাদের খাওয়ার পরিমাণ এত বেড়ে গেল, প্রফুল্লদা বলতে শুরু করল, 'এইবার আমাদের কোম্পানি ফেল করবে গো।' আমার যে ছোটখাট একটা ভুঁড়ি হচ্ছে, সেটা আমি টের পেতুম প্যান্ট পরতে গিয়ে। আর কাশি! দিনে বার চারেক ইঁদারার জলে আমার ও প্রফুল্লদার হাতির চান হত। তাতেও কাশির দেখা নেই।

প্রফুল্লদা আর আমার রাতটাও ছিল সুন্দর। পাঁচ সেল-এর বিশাল একটা টর্চ আর হাতে একটা লাঠি নিয়ে আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতুম স্টেশানে। স্টেশান আজও আমাকে পাগল করে দেয়। জীবনের পরম সত্যের মতো। মানুষ আসে, মানুষ যায়। শেষ পর্যন্ত কেউই থাকে না। প্রাণহীন রেললাইন সব সময় ভীষণ একটা প্রতীক্ষা বুকে নিয়ে পড়ে আছে। ট্রেন আসবে। আমরা দেখার বা শোনার আগেই রেললাইন শুনতে পায়। রেললাইনের কান যে অনেক বড়। একা একা

আলো জ্বলে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকে গাছ। ঝিম মেরে বসে থাকে দু'একজন দেহাতী যাত্রী। তারবাবু খটখট আওয়াজ করেন যন্ত্রে—টরে টরে টক্কা টরে, এই হল বর্ণপরিচয়। ঝাঁ-ঝাঁ করে টেলিগ্রামের তার।

আমরা দু'জনে ওভারব্রিজে উঠে মাঝখানটায় বসে থাকি, রেলিং ধরে নিচে পা ঝুলিয়ে। আমাদের আকর্ষণ, রাত এগারোটায় আসবে ডাউন মেল। বিশাল ট্রেন। আমাদের পায়ের নিচে এসে থেমে পড়বে। আমরা অনেকটা ওপর থেকে দেখতে পাবো ট্রেনের ছাত। সার সার ডুমো ডুমো ডিম বসানো। পরিষ্কার। ছাই ছাই রঙ। শান্ত স্টেশান হঠাৎ ছটফট করে উঠবে। হকার হাঁকবে চাগ্রম। পানি পাঁড়ে বলবে জল। হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা বাঁশি বাজবে। ট্রেন তখন কয়লায় চলত। ইঞ্জিন বুক-কাঁপানো শব্দে স্টিম ছাড়বে। কোনো কিছু ছেড়ে যেতে হলে হয়তো এইরকমই একটা শব্দ করতে হয়। কোনো শব্দ শোনা যায়, কোন শব্দ শোনা যায় না। যেমন মানুষ চলে যাওয়ার শব্দ। ট্রেনটা ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যাবে। গার্ডের কামরা। একজন মানুষ, হাতে ফ্ল্যাগ। কে যেন পেছন থেকে তাঁর জামার কলার ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে। তাঁর ঘরটা গোটা ট্রেনের তুলনায় রেলিং ঘেরা ছোট্ট একটা দেশলাইয়ের বাক্স। ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর স্টেশান রাতের মতো ঘুমিয়ে পড়বে। কাঠের সিঁড়িতে আমাদের পায়ের শব্দ। ভীষণ নির্জন পথ, দু'পাশে নিঝুম বাগানবাড়ি। ঘুমঘুম চোখে বাড়ি ফিরে এসে সোজা বিছানায়। তিন মাসের মাথায়, বাবার যেমন আসার কথা ছিল মাকে নিয়ে, এসে গেলেন। পুজো সবে শেষ। শীত আসছে। সকালে আর সন্ধ্যের পর বেশ ঠাণ্ডা। মরসুমী ফুলে বাগান হাসছে। গোলাপের বাহার। ভেলভেটের মতো পাপড়ি। তার ওপর মধুর মতো সকালের শিশির।

জ্যাঠামশাইয়ের চেহারা দেখে বাবার কি আনন্দ। বহুবার হাজারি-বাগে এসেছেন। সেইসব স্মৃতি মনে খইয়ের মতো ফুটছে। ভোরের বেড়ানো যেন আরো আনন্দের। রাস্তার বাঁকে বাঁকে পুরনো দিনের ঘটনা বাঘের মতো ওত পেতে আছে। মেজদা মনে আছে, বলে বাবা শুরু করছেন, আর অতীত উড়ে উড়ে আসছে ঝাঁক ঝাঁক পাখির মতো। মা আর জ্যাঠাইমা, দাদু বলছেন, 'আহা! কতকালের দুই সখী। কেমন হাত ধরাধরি করে মশগুল হয়ে চলেছে দেখো।'

আর তিন দিন। ফিরতে হবে কলকাতা। শরৎকাকু টিকিট রিজার্ভ করে দিয়েছেন। পাম নদীর ধারে পিকনিক হল একদিন। শরৎকাকুর গাড়ি হর্ন দিতে চলল। যেন সিনেমার শুটিং পার্টি চলেছে। কাঁচের মতো নদী। তলায় চিকচিক করছে বালি, অভ্রের কণা। ছোট ছোট মাছ, যেন প্রকৃতির নিজস্ব অ্যাকোয়ারিয়াম। গাছের ছায়ায় ছায়ায় সারাটা দিন কেটে গেল স্বপ্নের মতো। জ্যাঠামশাইয়ের কত রকমের গল্প। ছেলেবেলার গল্প, স্কুলের, কলেজের গল্প। মা আর জ্যাঠাইমা দাদুর জন্যে একটা বিছানা নিয়ে গিয়েছিলেন। গোল একটা বালিশ।

সন্ধ্যের কিছু পরে আমরা ফিরে এলুম। আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আমরা আছি। সকলেই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন। বেশ শীত এসে গেছে। অনেক দিন পরে মাকে জড়িয়ে শুয়েছি। স্বপ্নের মতো চোখে ভাসছে নদী, বন, রোদ, ছায়া, মাছ। কানে হাসি, গান, গল্প।

মনে হয় সকাল হয়েছে। প্রফুল্লদা ভীষণ জোরে জোরে ডাকছে। পাশে মা নেই। সবাই বাগানের দিকে ছুটছেন। সাদা গোলাপগাছ। টাটকা ফুল ফুটে আছে। ঘামের মতো শিশির মাখা। গাছের গোড়ায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন জ্যাঠামশাই। ডান হাতে একটা সাদা গোলাপ। জ্যাঠামশাই মারা গেছেন। চলে গেছেন তিনি একটি গোলাপ হাতে নিয়ে। ডাক্তারবাবু এসে বললেন, হার্ট অ্যাটাক।

সাত

কাশি? এত বছর বয়সে হয়ে গেল, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মানুষ কোনো না কোনো সময়ে কাশছে, আমি জানি, আমার আর যাই হোক কাশি কোনো দিন হবে না। কেন? নিজের জীবন দিয়ে আমার ছাগুলে কাশি সারিয়ে দিয়ে গেছেন আমার জ্যাঠামশাই। হাজারিবাগে তো কত মানুষই আগে আগে চেঞ্জে যেতেন। একটু বায়ুপরিবর্তন। স্বাস্থ্যে সামান্য চেকনাই। এর বেশি কার কি হয়েছে! আমার যে ধাতটাই পাল্টে গেল। সে হাজারিবাগের জন্যে নয়। আমার জ্যাঠামশাইয়ের জন্যে।

হাজারিবাগ হল আমার কাশী, আমার বারাণসী।

বছরে একবার, শীতকালে আমি হাজারিবাগে যাবই। কয়েকদিন থেকে চলে আসি। প্রথমে যাই ফুলের জলসায়। সেই বাড়ি আর নেই। ধ্বংসাবশেষ। সুখের দিন, মানুষের বোলবোলা বেশি দিন থাকে না। সে বাগান নেই। স্থানীয় এক কাঠ-ব্যবসায়ী কিনে নিয়েছেন। বড় বড় কাঠের গুঁড়ির ডাঁই। অমন সুন্দর বাড়ি যেন একটা খাটাল। তবু আমি সব দেখতে পাই। কল্পনায়। তারপর যাই পাম নদীর ধারে। নির্জন সেই জায়গাটায়, যেখানে জ্যাঠামশাইকে সৎকার করা হয়েছিল। গাছের ফাঁক দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়ে। বালি চিকচিক করে। নদী বছরের পর বছর আমার জ্যাঠামশাইকে গান শোনায়। সেদিন যাঁরা ছিলেন আমি ছাড়া আজ আর কেউ নেই। আমি শেষ প্রতিনিধি। আমি মৃদু গলায় ডাকি, 'জ্যাঠামশাই!'

উত্তর পাই, 'কি বাপি! কেমন আছ তুমি?'

আমি বলি, 'আমার বয়েস বেড়ে গেছে জ্যাঠামশাই। এখনো আমাকে বাপি বলছেন?'

জ্যাঠামশাই হাসেন, না নদী হাসে, না গাছে হনুমান হাসে আমি বলতে পারব না। সেই অদ্ভুত মিষ্টি হাসি শুনতে পাই! জ্যাঠামশাই বলেন, 'তুমি তো অতীতে চলে এসেছ। তোমার বারো বছর বয়েসটা এই গাছের ছায়ায় নদীর ধারে পড়ে আছে বাপি! খামে ভরা চিঠির মতো।'

আমি তখন এক মুঠো বালি তুলে বাতাসে ছেড়ে দি। অভ্রের কণার মতো ছড়িয়ে পড়ে। হাসি কান্না হীরে পান্না।



ফুল হয়ে ফোটার কালে

আমি যে স্কুলে পড়তাম সেই স্কুলের নাম ছিল ভিক্টোরিয়া স্কুল। ভিক্টোরিয়া স্কুল কিন্তু কলকাতার ভিক্টোরিয়া নয়। বরানগরে গঙ্গার ধারের ভিক্টোরিয়া স্কুল। কুইন ভিক্টোরিয়ার যে বছর জুবিলি হল, সে বছর ঐ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গঙ্গার ধারে বিরাট সুন্দর স্কুল, বিরাট মাঠ। আমি যখন ঐ স্কুলে পড়তাম তখন স্কুল কম্পাউণ্ডে দুটো বিশাল বড় বড় অর্জুন গাছ ছিল। এখনও আছে গাছ দুটো। তার কারণ, গাছের পরমায়ু আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। ঐ স্কুলে আমি যখন পড়েছিলাম, তখন তোমাদের মতো বয়েস। আজ আমি প্রবীণ। আর কিছুকাল পরে হয়তো চলেই যাব, কিন্তু ঐ অর্জুন গাছ তখনও বেঁচে থাকবে আর ঐ গঙ্গা তখনও প্রবাহিত হবে।

ওই স্কুলের ভিতরে যখন ঢুকি, দেখি একটা ঘোরানো সিঁড়ি। তারপর প্রধান শিক্ষকের ঘর। সেই ঘরে, প্রথম যেদিন আমি ভর্তি হতে যাই সেদিনের স্মৃতি আজও স্পষ্ট মনে আছে। সেটা ছিল শীতকাল। তখন স্কুলের ভর্তি-টর্তিগুলো সব শীতের দিকে হত। এখন তোমাদের নতুন ব্যবস্থা কী হয়েছে আমার মাথায় আসছে না। এখন আমাকে একজন বললে যে, একালের ছেলেমেয়েরা কী পড়বে সেটা যদি জানতে পারে তাহলেই পাশ করে যাবে। আমাদের সময় এত ঝামেলা ছিল না। আমার পিতা ছিলেন খুব ব্যস্ত মানুষ আর ভীষণ কড়া। কোনও কাজেই ফাঁকি দেবার জো ছিল না। কোনও রকম অসভ্যতা বরদাস্ত করতেন না। ভীষণ কর্তব্যনিষ্ঠ। তিনি আমার দাদুকে বললেন যে, 'একে এবার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হোক।' তার কারণ আমার তখন স্কুলে ভর্তি হবার খুব ইচ্ছা জেগেছে। সেকালের রেওয়াজ ছিল ছেলে-মেয়েদের খুব তাড়াতাড়ি স্কুলে ভর্তি না করা। প্রথমে বাড়িতে তাদের খুব ভাল করে পড়ানো হবে। বাংলা, হাতের লেখা, ইংরেজি, গ্রামার, ব্যাকরণ, অঙ্ক সবকিছুই খুব ভালভাবে শেখানো হবে। এটাকে তাঁরা

বলতেন ভিত বা ফাউন্ডেশন্। সেটা তৈরি হওয়ার পর স্কুলে শুধুমাত্র ভর্তি হয়ে পরপর পরীক্ষায় পাশ করা। অর্থাৎ যদি ভিতটা কাঁচা হয় তাহলে ভবিষ্যতে শিক্ষার যে বনিয়াদটা তৈরি হবে বা বাড়িটা তৈরি হবে সেটা নড়বড়ে হতে পারে। আমার মন কিন্তু মানে না। কত বড় হয়ে গেলুম। ইজের ছেড়ে হাফ প্যান্টে প্রোমোশন। সব বন্ধু-বান্ধবেরা স্কুলে চলে যাচ্ছে অথচ আমি যেতে পারছি না। তখন আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। রোজ আমি তখন করতাম কী, গোটা চার-ছয় বই বগলে নিয়ে ঠিক স্কুল যে সময় শুরু হয় সে সময় আমাদের বাড়ির দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতাম। আমাদের বাড়ির দুটো সিঁড়ি ছিল, একটা সামনের একটা পিছনের। আমাদের সেই বাড়িটা ছিল গঙ্গার ধারে। বরানগর যখন ওলন্দাজদের ছিল তখন ওই বাড়িটা ছিল তাদের কর্মচারীদের আস্তানা। ওই বাড়িটার আবার খ্যাতি ছিল ভূতের বাড়ি বলে। আমার দাদামশায় বাড়িটা কিনেছিলেন। সবাই সে সময় 'এটা ভূতের বাড়ি, এটা আপনি কিনবেন না, চাটুয্যেমশায়' বলে নিষেধ করলে তিনি বলেছিলেন, 'আমি ভূত-প্রেতে ভয় পাই না, কারণ আমি ব্রহ্মদৈত্যকে গান শুনিয়েছি—সে আবার অন্য এক গল্প।'

সেই বাড়িটার সামনে সিঁড়ি দিয়ে নামলে, মানে আমাদের ঐ বাড়িটার সামনের দিকটায় ছিল একটা কাছারি বাড়ি। আমার মনে হত ঐ জায়গাতে কোনও বিচারস্থল বা আদালত-টাদালত ছিল। কারণ সেখানে ছিল একটা কাঠের ঘেরা বারান্দা। আর তার পাশ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে, সিঁড়ি উঠে গেছে। ঐ সিঁড়ি দিয়ে নামতাম, নেমেই পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে আসতাম। এসেই টেবিলে খাতাপত্র সব ছড়িয়ে দিতাম—যেন স্কুলে গিয়েছি। সারা দুপুর লেখাপড়া করতাম। কারণ দেখতাম আমার বাড়ির পাশের স্কুল চলছে। স্কুলে যখন টিফিন হত আমারও টিফিন হত। যখন ছেলেরা ছুটির পর বাড়ি ফিরত, আমি তখন বাইরের গেটে গিয়ে মোড় থেকে, যেন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি, এইভাবে ফিরতাম। এই দেখে সকলে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, না একে এবার স্কুলে ভর্তি করা হোক। তখন আমি দাদুর সঙ্গে ক্লাস সেভেন-এ ভর্তি হওয়ার জন্য গেলাম।

আমি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম ক্লাস সেভেন-এ। স্কুলের হেড-মাস্টারমশাই-এর ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে দেখি ব্ল্যাক

বোর্ডে চক দিয়ে বড় অক্ষরে লেখা টাঙানো রয়েছে 'আপ'। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বসে আছেন একটা নীল রঙের গরম কোট পরে। তিনি আমাকে ডাকলেন। আমার দাদুর তখন খুব খ্যাতি ছিল ঐ অঞ্চলে, নামী মানুষ। কারণ প্রথমত তিনি খুব ভাল গাইতে পারতেন, দ্বিতীয়ত তাঁর দারুণ ভাল চেহারা ছিল, ছয় ফুট লম্বা, সাংঘাতিক টকটকে রঙ এবং পৃথিবীর কোনও লোককেই কখনও পরোয়া করতেন না। একবার এক কাবুলিওয়ালাকে এক চড়ে চিৎপাত করে ফেলে তিনি সেই সময় একটা রেকর্ড করে ফেলেছিলেন। তখন সকলের ধারণা ছিল কাবুলি-ওয়ালাকে কেউ কাবু করতে পারে না। সেই কাবুলিওয়ালার কাছে পাড়ার একজন কিছু টাকা ধার করেছিল। কাবুলিওয়ালা এসে তাকে বাঙালি বলে খুব গালাগালি দিচ্ছিল। আমার ঠাকুরদা তখন বাজার থেকে ফিরছিলেন। তিনি কাবুলিওয়ালার কান ধরে একটা চড় মারলেন। তিনি পড়ে গেলেন—। পড়ে পড়েই তিনি আমার দাদুর পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন : 'কভি এইসি নহি খায়া'। সেদিন বাঙালির আনন্দ দেখে কে। দাদুর দিকে তাকিয়ে প্রধান শিক্ষক বললেন, 'ও তো আপনাদের ফ্যামিলির ছেলে, আচ্ছা আমি গোটা কতক ট্রানস্লেশন জিজ্ঞেস করছি। ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারলে আমি ভর্তি করে নেব।' বলে সাতটা ট্রানস্লেশন বললেন পর পর বাংলা থেকে ইংরেজি করতে। আমি করে দিলাম। ব্যস, তিনি খুব খুশি। ক্লাস সেভেন-এ ভর্তি হয়ে গেলাম।

সেই স্কুলের স্মৃতি তোমাদের বলতে বসে আমার দুঃখ হচ্ছে। এখন স্কুলের আর সেই বৈশিষ্ট্য নেই, সেই ঐতিহ্যও নষ্ট হয়ে গেছে। পরবর্তীকালের অনেক বড় বড় কবি, মন্ত্রী, অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সে সময় ঐ স্কুলে পড়েছেন। স্কুলের বাইরে, ঢোকার মুখে একটা মার্বেল ফলকে লেখা আছে কোন্ কোন্ বরেণ্য ব্যক্তি এই স্কুলে পড়ে গেছেন এবং পরবর্তী জীবনে তাঁরা কে কী হয়েছেন এবং তাঁরা কে কী নম্বর পেয়েছেন এফ. এ বা ম্যাট্রিক পরীক্ষায়।

আমাদের স্কুলের বাইরে কোয়ার্টারে একজন দারোয়ান থাকতেন। তাঁর কাজ ছিল আমাদের নজরে রাখা। তাঁর কথা আমি কোনওদিন ভুলব না। নাম ছিল রামাধর। তোমাদের সময়ের মতো আমাদের সময়ে স্কুলে যাবার জন্যে কোনও নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম ছিল না। আর তোমরা

এখন স্কুলে এসে তোমাদের লটবহর কোথায় রাখো জানি না। তাতে নিশ্চয় অনেক কিছু আছে—টিফিন বাক্স, জলের বোতল, নানারকম পেন্সিল রাখার বাক্স। আমাদের কিন্তু এসব ছিল না। বই, লাল কাগজের ঘরে বাঁধাই করা সাদামাটা খাতা, পেনসিল। সাজ-পোশাকেরও কোন রকম বাছ-বিচার ছিল না। যে কেউ যা খুশি পরে আসতে পারত, তবে তা যেন পরিষ্কার হয়।

'আমার পরিবার তো খুব কড়া পরিবার ছিল যে কারণে আমার বাড়ির প্রথম নির্দেশ ছিল এই যে, যতদিন তুমি স্কুলের ছাত্র, যতদিন পর্যন্ত তুমি কোন চাকরি না করছ ততদিন পর্যন্ত তোমার কোন কাপ্‌তেনি চলবে না। কাপ্‌তেনি বলতে কী বোঝায়? চুল ওলটানো যাবে না। মাসে একবার করে একজন যিনি চুল কাটেন তিনি আসবেন একটা কাঠের বাক্স নিয়ে। আমাদের গেটের সামনে ইটের উপর আমাকে বসাবেন। একটি খবরের কাগজ গোল করে কেটে গলায় গলিয়ে দেবেন। তারপর হাঁটুর মধ্যে আমার মাথাটাকে চেপে ধরবেন। আমার পিতার নির্দেশে চতুর্দিক থেকে কাটতে কাটতে তিনি কেবল জিজ্ঞেস করবেন, 'ছোটবাবু আপনি ঠিক ঠিক বলুন।' পিতা বলবেন 'সামনের দিকে তিন ইঞ্চি, পেছনের দিকে তিন ইঞ্চি সমান করতে হবে। তারপর আরও তিন ইঞ্চি, তারপর ওপাশ থেকে আরও দু'ইঞ্চি সোজা কর। শেষে তিনি বলবেন, 'ছোটবাবু এরপর ত চুল আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না।' আমার জন্যে তাঁর করুণা হবে। পিতা তখন বলবেন, 'খুঁজেই যখন পাচ্ছ না তখন পুরোটাই উড়িয়ে দাও।'

যিনি আমাদের বাড়িতে চুল কাটতে আসতেন তাঁর নাম ছিল মণিকাকা। মণিকাকাব বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ির পাশেই। যেই দেখতাম চুল বড় হয়েছে, এর বেশি বাবা সহ্য করবেন না, আমি তখন মণিকার কাছে যেতাম। গিয়ে বলতাম, 'এবারে যখন রবিবারে আমাদের বাড়িতে চুল কাটতে আসবেন, ক্ষমা-ঘেন্না করে একটু দেখবেন চারদিকটা যেন থাকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, 'উঁহু, ছোটবাবুর অর্ডার নেই। তুমি তো যাত্রা করবে না, থিয়েটার করবে না, তোমার এত বড় চুলের দরকার কী?' শেষ পর্যন্ত ঘুষ। আমি তাঁকে একটা পাকা পেয়ারা কি বাগানের গাছের পাকা পেঁপে, জামরুল বা লোভনীয় কিছু একটা ধরিয়ে দিতাম। তিনি নির্বিবাদে সেগুলো হজম করে ফেলতেন। আর চুল

কাটার সময় তাঁর যা কাজ তা দক্ষতার সঙ্গেই করে যেতেন। চতুর্দিক দিয়ে কামিয়ে মাথার মাঝখানে একটা ছোট 'লন' মতো করে দিতেন।

আমাদের বাড়িতে আর একটা ব্যাপার ছিল—বাড়ির তোষক যে কাপড়ে তৈরি হত সেই কাপড়েই তৈরি হত আমাদের হাফ-প্যান্ট। আর যে কাপড়ে তৈরি হত পর্দা সেই কাপড়েই তৈরি হত আমাদের জামা। আর বাইরের জুতো—সেটা যতদিন পর্যন্ত না নিজে থেকে বলত আর আমি পায়ে ধরতে পারছি না, ততদিন পর্যন্ত সেটাকে টেনে বেড়াতে হত। আমার বাবা রবিবার দিন নিজেই জুতো মেরামত করতে বসতেন। বলতেন, 'আয় তোর জুতো নিয়ে আয়।' তালি মারতে মারতে এমন হত যে শেষ পর্যন্ত তার কোনটা আসল আর কোনটা নকল বোঝা যেত না। আসল চামড়াটা চেনবার প্রায় কোনও উপায়ই থাকত না। বলতেন, 'না, বাবুগিরি চলবে না, বিলাসিতা চলবে না। অপচয় করো না। জেনে রাখো—ওয়েস্ট নট ওয়ান্ট নট। অপচয়ই অভাবের কারণ।'

আমার এই যে অনাড়ম্বর ছেলেবেলা, মাঝে মাঝে সেই জীবনে খুব বিরক্ত হতাম। কারণ, আমাদের পাশেই ছিল বিরাট বিরাট বড়লোকদের বাড়ি। সে সময়কার বড়লোকেরা চওড়া পাড় কাপড় পরতেন। যাকে বলে কাঁচি ধুতি। আর যাঁরা খুব বড়লোক তাঁদের পাড়ে নাম লেখা থাকত। যেমন ধর দেবকীভূষণবাবু কাপড় পরেছেন। 'দেবকীভূষণ' 'দেবকীভূষণ' এ রকম একগাদা দেবকীভূষণ পাড়ে লেখা থাকত। আর তিনি কাপড় কেচে আসার পর ইস্ত্রি করে পাড় কুঁচিয়ে নিতেন, যাকে বলে চুনোট করা। কোঁচাটা কুঁড়ি করে নিয়ে হাতে করে চলতেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সিল্কের পাঞ্জাবি পরা, গলায় আবার একটা লকেট। তা এইরকম লোকেদের দেখলে আমার পিতা বলতেন, 'বলো, তুমি এরকম হতে চাও কিনা ?' তা সত্যিই আমার কীরকম অদ্ভুত লাগত। একটা পুরুষ মানুষ, থলথলে চেহারা, একটা কোঁচা এরকম করে ধরে, গলার লকেট পরে, কীরকম আদুরে খোকা খোকা হয়ে চলেছেন। বলতাম, 'কখনও নয়'। সে জন্যই আমাদের ব্যবস্থা ছিল অন্যরকম। এখনকার কালের বোতাম দেওয়া প্যান্ট ছিল না, ছিল ইজের। দড়ি বাঁধা, বাঙালি ব্যাপার। প্যান্টের সামনে বাড়তি অংশের লটরপটর সবাই বলতেন—কোমরের নেকটাই। বগলে দুটো বই, তিনটে ছেঁড়া খাতা, আর একটা পেন্সিল—এই নিয়ে আমরা স্কুলে যেতাম। তোমাদের স্কুলে যাবার সময়

পায়ে মোজা, চামড়ার জুতো, চুলের কেয়ারি, টিফিন বাক্স—সবই থাকে। আমাদের কিন্তু এ সবের কোনও ব্যাপারই ছিল না। স্কুল শুরু হয়ে যাবে, এই তাড়া থাকায় কোন রকমে দু'ঘটি জল মাথায় ঢালতাম। জল ঢালার পরেই ঐ ভিজে চুলটাকেই এপাশ থেকে ওপাশ করে খেতে বসা। কানের পাশ, পিঠ দিয়ে জল গড়াত। এরপর স্কুলে ঢুকেই যে কাণ্ডটা শুরু হত, তা হচ্ছে, কে কোন বেঞ্চির কোন জায়গায় বসবে তা নিয়ে তাণ্ডব। শিক্ষক মশায় এর আসনের পাশেই ব্ল্যাকবোর্ড রয়েছে। আর রয়েছে একটা ডাস্টার, দুটো কাজে ব্যবহৃত হবার জন্য। এক বোর্ড মোছার কাজ, দুই আমাদের মাথায় পড়বার কাজ। এটাকে বলে একালের ভাষায় ডবল-অ্যাকশন—যা কখনও বোর্ডের মাথায় থাকবে কখনও পড়বে আমাদের মাথায়। সেকালের স্কুলে যে কোনও রকম প্রহার বা ধোলাই নীরবে সহ্য করতে হত। হয়তো স্কুলে টিফিনের পরে ঢুকছি, দেখি ক্লাশের বাইরে প্রচণ্ড মার খেয়ে তিনটে ছেলে কান ধরে বসে আছে, নিল ডাউন। মুখ-চোখ সব ফুলে গেছে। তাদের ঐ করুণ অবস্থা দেখে আমারই কী রকম ভয় ভয় করতে লাগল। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রে খুব কষ্ট হচ্ছে?' একজন আবার ঐ অবস্থায় আমাকে মুখ ভেঙিয়ে দিল এবং সেই দৃশ্য চোখে পড়ে গেল সংস্কৃতের পণ্ডিত মশাইয়ের। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চাপিয়ে দিলেন আর এক ডোজ। সুযোগ হাতছাড়া করতে নেই।

ভাগ্য কার কখন খারাপ হবে কেউ জানে না। ভাগ্য হয়তো মলয়কে দেখে, তার করুণ অবস্থা দেখে হাসছে কিছুক্ষণ পরে হয়তো আমিই মলয়ের জায়গায় চলে গেলাম। সে জন্য আমরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা শিক্ষকদের খুব সমীহ করতাম। সভয়ে ঢুকতাম এবং কারও করুণ অবস্থা দেখলে খুব ভয়ে ভয়ে থাকতাম। এখন তোমরা যখন স্কুলে আসো সেটা অনেকটা কলেজে আসার মতো তাই না? কারণ আমি জানি এমন স্কুলও আছে যেখানে কোন শিক্ষক মহাশয় কোন ছাত্রকে যদি তিরস্কার করেন তবে তাঁকে বিস্তর দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়। যেমন আমি কলকাতার একটা নামী স্কুলের কথা জানি, যেখানে আমার খুব পরিচিতা এক মহিলা ইংরেজির শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি একটি ছেলেকে পড়া পারেনি বলে বকেছিলেন। সে তখনি বলেছিল, 'ডাঁটিয়ে মত—শুনিয়ে মেরা পকেট-মানি ডেলি একশ রুপিয়া হ্যায়।' যে রোজ একশ

টাকা পকেট-মানি পায়, সে একজন সাধারণ শিক্ষিকার বড় গলা শুনবে কেন? হোক সে শিক্ষিকা—তাতে কী হল? তিনি পরদিনই চাকরি ছেড়ে চলে এলেন। এই তো সব স্কুল যেখানে বকা যাবে না। আমাদের কালে তো ছেলেদের এইভাবে মানুষ করা হত না। তারা কষ্টে মানুষ হত।

আমার মনে আছে, আমাদের যিনি অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন তিনি করতেন কি ক্লাসে এসেই প্রথম বেঞ্চ থেকে শেষ বেঞ্চ পর্যন্ত সবাইকে বেধড়ক পিটিয়ে দিতেন। কাউকে চড়, কাউকে কানমলা, কাউকে ডাস্টারের আদর, এইভাবে পুরোটা ঘুরে এসে, আমাদের মতো কয়েকজনকে আরও জব্দ করার জন্যে কঠিন একটা অঙ্ক বোর্ডে লিখে দিয়ে বলতেন, 'কর দেখি'। আমাদের বোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হত। একে একে। যথারীতি আমরা কেউ পারতাম, কেউ পারতাম না। যারা পারত না সবান্ধবে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দিতেন। হাফ-প্যান্ট পরা ছেলেরা সারিবদ্ধভাবে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—কী রকম লাগে! প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনে এমন কোনও কাজ করব না যাতে আমার গায়ে কোন শিক্ষক কোন কারণে হাত তুলতে পারেন। এটা শুধু লেখাপড়া নয়, অন্য সব ক্ষেত্রেও এটা করতে হবে এই ছিল সংকল্প। একদিন আমাদের যিনি বাংলা পড়াতেন, মঙ্গল ভট্টাচার্য, তিনি এসেই আমাকে ঠাঁই করে বেত দিয়ে মারলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম, 'আপনি কেন মারলেন?' বললেন, 'আমার মনে হল তুই আজ পড়া পারবি না।' ভীষণ রেগে গিয়ে বললাম, 'এটা মুখে বললেই পারতেন স্যার। কোনও প্রশ্ন না করেই আপনি আমায় মারলেন কেন?' তখন আমি ক্লাশ নাইনে পড়ি। উনি বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে প্রশ্ন হয়ে যাক—' বলে তিনি আমাকে একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগলেন…

আমি ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে কিছু একটা লেখার চেষ্টা করতুম। একথাটা বলার একটাই কারণ, প্রত্যেক মানুষের গোটাকতক গর্বের স্থান থাকা দরকার। আমার আর একটা গর্ব হল নিজের পরিবার। আমি এমন একটা পরিবারে জন্মেছি যেখানে আমার বাবা, আমার মা, আমার ঠাকুর্দা, আমার জ্যাঠামশায়, আমার দাদু, এঁরা সবাই ছিলেন গুণী। সকলেই সম্মান করতেন। তাঁদের জীবনই ছিল আমার উদাহরণ। মনে হত আমাকেও ওইরকম হতে হবে। মানী, গুণী। সবাই যেন আমার

জন্যে গর্ব অনুভব করে।

আমার যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স, সেই সময় আমার মা মারা গেলেন। মা মারা যাবার পর আমি একেবারে একা। আমাকে স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রাখলেন আমার জ্যাঠামশাই ও জ্যাঠাইমা। আমার জ্যাঠামশায় অত্যন্ত ভালমানুষ ছিলেন। আমার মা মারা যাবার পরই দাদু এসে পড়লেন। আমার মা আমার দাদুকে ভীষণ ভালবাসতেন। আমার দাদু, আমার মামা এঁরা সবাই লেখাপড়া-সঙ্গীত-স্বাস্থ্য-রূপে-গুণে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পেঁছেছিলেন যে 'মামার বাড়ি যাচ্ছি' বলতে যেন একটা অন্য জগতে পেঁছে যেতাম। যখনই যেতুম মনে হত একটু আগেই সেখানে একজন গান গেয়ে গেলেন তার রেশ তখনও মেলায়নি। মামার বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকলেই শুনতে পেতাম একটা অসাধারণ সুরেলা সঙ্গীতের আওয়াজ। একসঙ্গে তিন-চারটে তানপুরা বাজছে, হারমোনিয়াম বাজছে এবং থেকে থেকে আমার মামা কোনও একটা রাগ-রাগিণী রেওয়াজ করছেন।

সেকালে আমার মামা ছিলেন ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত গায়ক। তিনি গিরিজাবাবুর ছাত্র ছিলেন। এছাড়া তিনি দিলীপচাঁদ বেদির কাছে খেয়াল শিখেছেন। তাঁকে দেখে অনেকে আমাকে বলতেন 'তোর মামা এত সুন্দর দেখতে—তোকে এরকম মর্কটের মতো দেখতে কেন?' আমি করুণ মুখে উত্তর দিতুম, 'আমার মা পাঁচ বছর বয়সে মারা গেলেন কিনা, তাই আমি এ-রকম দেখতে।' তখন সবাই উল্টে জিজ্ঞেস করতেন, 'মা মারা গেলে এরকম হয় নাকি?' মা মারা গেলে যে কী হয় সেটা আমি জীবনে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। যে কারণে আমি পরের বার যদি জন্মাই, ঈশ্বরের কাছে একটিই প্রার্থনা করব, হে ঈশ্বর ছেলেবেলায় যেন মা'কে হারাতে না হয়। ছেলেবেলায় কারো যদি মা মারা যান, তাহলে তার জীবনে আর কোনও কিছুই থাকে না। দুঃখটা কীরকম যেন মন থেকে বেড়ে ওঠা একটা গাছের মতো হয়ে যায়। মা না থাকলে আর সব কিছুই থাকে, সন্দেশ থাকে, রাবড়ি থাকে, ভাল জামা কাপড় থাকে, ভাল স্কুল থাকে, কিন্তু একটা জিনিস থাকে না সেটা হচ্ছে ছায়া। একটা স্নেহ, মানে আমার ছেলে আমার খোকা বাড়ি ফিরে আসছে স্কুল থেকে, আমার খোকা খেতে বসবে, এই কথা বলার মতো কেউ থাকেন না। আমার ছেলেবেলায় আমি দেখতাম খাওয়ার সময়ে সামনে একটা থালা

পড়ল, চারপাশে তরকারি সাজানো হয়ে গেল, চতুর্দিকে বাটি এসে গেল —আমাদের বাড়ির চারজন কাজের লোক এগুলো সব করেছে। তারা সবই করছে কিন্তু তার মধ্যে কোনও স্নেহ নেই, ভালবাসা নেই। আসল কথাটা হল—ধরো যদি তুমি কাউকে একটা হীরের আংটি দাও কিন্তু তার মধ্যে কোনও ভালবাসার ছোঁওয়া না থাকে তা সে দেওয়ার কোনও মানেই হয় না। আর তুমি যদি রাস্তা থেকে একটা নুড়ি কুড়িয়ে ভালবেসে কারোকে দাও, দেখবে সেই সামান্য উপহার ভালবাসার ছোঁয়ার হীরে হয়ে গেছে। নুড়িটা হবে স্নেহের, একটা প্রতীক যা পুরো হৃদয়টা দখল করে ফেলবে। সেজন্য বেঁচে থাকার প্রধান শর্ত হচ্ছে একটা ছেলে বা মেয়ে যেন ভালবাসার মধ্যে বড় হয়, শাসন নয়, শৃঙ্খলা নয়, প্রাচুর্য নয়, ঐশ্বর্য নয়। তার চারপাশ ঘিরে এমন কিছু মানুষ থাকবে যারা তাকে ভালবাসবে। যাঁদের থাকা না-থাকার উপর ছেলেটির জীবন নির্ভর করবে। এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা।

আমার মা মারা যাবার পর আমার বাবা একই সঙ্গে মা এবং বাবা হয়ে আমাকে মানুষ করতে লাগলেন। তখন শীতকাল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। হঠাৎ হঠাৎ সাইরেন বাজা—বিমান আক্রমণ—আর সাইরেন বাজা মাত্র নীচের ঘরের শেল্টারে চলে যাওয়া—সে এক গল্প। এভাবে চলতে চলতে আমাদের বাড়িতে একটা সময় এল যখন জ্যাঠাইমা এগিয়ে এলেন, বললেন, 'ওর মা মারা গেছে ত কী হয়েছে, আমি ত আছি। আমার এই জ্যাঠাইমা বার্মার রেঙ্গুনে বড় হয়েছিলেন। তিনি সেখানে সে-সময়কার সবচেয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। তিনি কী না জানতেন। কারণ তখন বার্মা বা ব্রহ্মদেশ নারী স্বাধীনতার দেশ ছিল। তিনি সেই দেশে মানুষ হয়েছিলেন বলে তাঁর সাজপোশাক, চালচলন সব সে দেশের মতো ছিল। আর আমাদের বাড়িতে একটু ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম হাওয়া বইত অর্থাৎ নারী স্বাধীনতা আমাদের বাড়ীতে চিরকালই ছিল। মেয়েরা শৃঙ্খলিত থাকবে না, তারা ভাল জামাকাপড় পরবে, গান গাইবে, লেখাপড়া শিখবে, রাঁধবে, বেড়াতে যাবে, একসঙ্গে বসে গল্প করবে এটাই ছিল এ বাড়ির রীতি। আমাদের বাড়িতে একটা বিরাট ছাদ ছিল, সে ছাদের কোনও আলসে ছিল না। কেন না—আলসে থাকলে নাকি আকাশ দেখা যায় না। ছাতটা হয়ে যায় জলের ট্যাঙ্কের মতো। ছাদ হবে কী রকম, যেন আকাশের সঙ্গে মিশে থাকে। আমার বাবা খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন।

তিনি সেই ছাদে অন্তত আড়াইশো-তিনশো চন্দ্রমল্লিকার গাছ করেছিলেন টবে। সেও একটা অসাধারণ সাধনা। রাত্রিবেলা সাড়ে আটটা-নটার সময় এসে আমাকে বলতেন, 'টর্চ-লাইট ধর'। আমি টর্চ লাইট ধরতাম, আর তিনি একটি একটি করে চন্দ্রমল্লিকার পাতা তুলে তার তলা থেকে পোকা ঝেড়ে ফেলতেন। চন্দ্রমল্লিকার পাতার তলায় এক রকমের কালো কালো পোকা হয়, যা গাছকে নষ্ট করে। নরম ব্রুশ দিয়ে সেই পাতা ঝাড়া। এভাবে আড়াইশো চন্দ্রমল্লিকা গাছের পাতা ঝাড়তেন। সে এক মহাযজ্ঞ। প্রতি রাতেই এ ঘটনা ঘটত। আমি দেখতাম একটা মানুষ, তিনি ছিলেন সেকালের কলকাতার নামকরা গণিতজ্ঞ এবং কেমিস্ট। যিনি সারাদিন নিজের কাজকর্ম করে বাড়িতে এসে আমাদের পড়িয়েছেন। পড়িয়ে তিনি প্রায় মাঝরাতে ছাতে উঠছেন কেন? না এখন তিনি আড়াইশো গাছকে বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় রসদ পরিচর্যা দেবেন। এই আড়াইশো গাছ যখন ফুল হয়ে ফুটবে তখন তিনি কী আনন্দটাই না পাবেন। পৃথিবীতে সৃষ্টিই আনন্দ। পৃথিবীটাকে ফুল দিয়ে, ফল দিয়ে, সুন্দর জীবন দিয়ে ভরিয়ে দিলে পৃথিবীর চেহারাটা বদলে যাবে। সেকালের মানুষ ছিলেন এমনই নিষ্ঠাবান। নিজের বেঁচে থাকাটা তাঁরা তেমন গ্রাহ্যই করতেন না। নিজে খেলাম, নিজে পরলাম, নিজে ঘুমোলাম, এটা বড় কথা নয়। তাঁদের ধ্যান-ধারণা ছিল—আমার ছেলে একদিন মানুষ হবে এবং তাকে ঘিরে একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি হবে। সেই পরিবেশের মধ্যে কী থাকবে? সেই পরিবেশের মধ্যে গাছ থাকবে, ফুল থাকবে, সুন্দর স্বভাবের মানুষ থাকবে, গান থাকবে, প্রতি মুহূর্তে লেখাপড়ার একটা আবহাওয়া থাকবে, আবার কখনও কখনও বেশ মজার মজার মুখরোচক খাওয়াদাওয়া থাকবে, সামান্য আড্ডাও থাকবে, আর থাকবে নীল আকাশ, পাখির গান। যা আজকের জাপানে দেখা যায়। জাপানিদের বেঁচে থাকার ধরনটাও অদ্ভুত। জাপানে, কোন জাপানি যদি এক টুকরো জমি দেখে তো সেখানে তাঁরা রুমালের মাপের একটা লন ও একটি ফুলের বাগান তৈরি করবেনই। এই লন তৈরির কায়দাও অসাধারণ। সবুজের আঁচল পড়ে আছে যেন, তার চারপাশে সুন্দর সব ফুলের গাছ। সেখানে তাঁরা একটা আঁকাবাঁকা নদী তৈরি করতে পারেন। ছোট্ট কৃত্রিম নদী, তার ওপর হয়তো একটা সাঁকো। যখন চাঁদ ওঠে তখন জাপানিরা বসান মুনলাইট পার্টি। সারারাত বাগানে চাঁদের আলোয়—

'মুন গেজিং সেরিমনি'। কী দেখবেন—না চাঁদ। নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে আছে চাঁদের আলো। এমনি চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভাল। সে মরণ স্বরগ সমান আমাদের গান আছে, অনুভব নেই, উপভোগ নেই। রাত আসে লয়ে তারাদলে, চাঁদ হাসে নদীর জলে। আর আমরা সারারাত কাটিয়ে দি বেহুঁশ নিদ্রায়। এই তামসিকতার জন্যেই কি পৃথিবীতে মানুষকে পাঠিয়েছেন ঈশ্বর? মোটেই নয়। উপনিষদের ঋষিরা, বেদের ঋষিরা বলেছেন যে, 'যখন তুমি শিশু, সেই অবস্থায় তুমি সংসার ছেড়ে চলে এসো ঋষির তপোবনে। সেখানে তুমি শিক্ষার্থী, তোমার পরিবেশ হোম, যাগযজ্ঞ, তোমরা নিজেরাই শুদ্ধমনে দিন শুরু করো অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। হোমের আগুনে উৎসর্গ করো ঘৃত। অদ্ভুত সুন্দর সুগন্ধি ধূম আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। বাতাসের দগ্ধ বিল্ব-পত্রের পূত গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। সেই সুগন্ধ তোমার নাকে আসবে, তোমার মনে হবে, বহুদূরের ওপার থেকে ভেসে আসছে, স্মৃতি-চেতনা, আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যে জীবনে বেঁচেছিলেন, সে জীবনের ত্যাগ-নিষ্ঠা আর সাধনার সুগন্ধে সে জীবন ছিল মন্দিরের মতো। একালে একজন মস্তবড় সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী বলেছিলেন, প্রতিদিন হোম করবে, গায়ে হোমের ধোঁয়া মাখবে। তাহলে কী হবে? আমাদের বাইরে যে পশু-পশু গন্ধটা আছে সেটা চলে যাবে। এই পশুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বর অপ্রাপনীয়। ঈশ্বর এমন একটা শক্তি যা তোমাকে ভিতরে অনুভব করতে হবে। এই জানাটা তখনি সম্ভব হবে যখন তুমি নিজেকে সবচেয়ে বেশি পবিত্র করতে পারবে। এই পবিত্রতা আসবে জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে। পবিত্র জীবন কী করে যাপন করা যায় সেটা শেখাবেন আমাদের যাঁরা বড় করেছেন তাঁরা অর্থাৎ আমার পিতামাতা। আমার বংশ পরিচয়, আমার আত্মমর্যাদা আমাকে ঘিরে শৈশব থেকে যে পরিবেশ তাঁরা রচনা করেছেন সেই পরিবেশই গড়ে তুলবে আমার চরিত্র। আমার সবচেয়ে বড় গর্বের বস্তু হচ্ছে আমি এক বিদগ্ধ শিক্ষিত পরিবারের ছেলে। কেউ যদি ভাল পরিবারের ছেলে হয়, তার বাবা-মা, আত্মীয় পরিজন সম্পর্কে যদি তার একটা বিরাট গর্ব থাকে তাহলে দেখবে সে যদি দুটো ডিগ্রি-ডিপ্লোমা কমও পায়, তবুও সে প্রকৃত মানুষ হবে। হয়তো সে ধনী হবে না, মন্ত্রী হবে না কিন্তু তার ভিতরে অসাধারণ একটা ব্যাপার ঘটতে

থাকবে। কী ঘটবে? প্রথমত সে নিজেকে চিনতে শিখবে? অর্থ নয় ধন নয়, জন নয়, মান নয়, নির্লোভ হয়ে বেঁচে থাকার মহানন্দ। তৃপ্তি মানুষের মনে, দেহে নয়। যেমন যখন আমাদের কোনও ভাল খাওয়া দাওয়া হয়—এ প্রসঙ্গে একজন বড় লেখক বলেছিলেন, 'ভাল লেখার জন্য ভাল খাবার প্রয়োজন। কেন?' না—ভাল খাওয়ার পর মনটা বলে আঃ কী সুন্দর খেলাম! এই মন যতক্ষণ না পর্যন্ত আঃ করে উঠতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ভাল কাজই হয় না। সেইরকম সব কিছুই নির্ভর করছে মনের আঃ করার উপর। মনের ঐ আঃ করা নির্ভর করছে তুমি কী ধরনের জীবন ছোটবেলা থেকে বড়বেলা পর্যন্ত, সেই চিতায় যাবার আগে পর্যন্ত যাপন করছো তার উপর। সেই জীবন যাপন সম্পর্কে একটা কথা বলার ছিল সেটা খুবই আত্মিক—এটা ভগবানের পথ নয়, জীবনের পথ। চতুর্দিক থেকে নানারকম প্রলোভন তোমাকে ডাকবে, তোমার শত্রুরা সবসময় চাইবে তোমার আত্মপুরুষের মৃত্যু ঘটুক দেখো মানুষকে বাইরে দেখে চেনা কিন্তু বড় শক্ত। বাইরে সব এক। কিন্তু একজন মানুষের ভিতরে কী আছে তা বোঝা যাবে তার চরিত্র দেখে। সেখানে একজন মানুষ অন্যের দুঃখে কাঁদে, অন্যের বিপদে ছুটে যায়। আমার ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে আছে তখন আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের যাওয়া আসা, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে, আমেরিকান ট্রাক যাচ্ছে, ট্রেলার যাচ্ছে, গান-ক্যারেজ যাচ্ছে। একদিন কী কারণে আমি রাস্তাটা পার হতে যাচ্ছি এমন সময় একটা বড় ট্রাক তীরবেগে আসছে। আমি এক চুলের তফাতে, সেই ট্রাকের তলায় মৃত্যু অবধারিত। হঠাৎ এক মহিলা ঝড়ের বেগে ছুটে এসে আমার হাত ধরে এক টান মারলেন। দু'জনে মিলে পাশের একটা রকের উপর ছিটকে পড়ে গেছি। আমাদের কালে এই ধরনের মহিলা ছিলেন যাঁরা নিজের ছেলেকেই শুধু ছেলে বলে মনে করতেন না। অন্যের ছেলেকেও ছেলে মনে করতেন। উঠেই আমার মনে হল মহিলার কপালটা কেটে গেছে আর তিনি করলেন কী, ঐ অবস্থায় আমাকে বেধড়ক মারতে শুরু করলেন। কোনও হুঁশ নেই। তখন অন্য সবাই তাঁকে ধরে ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে মাথায় স্টিচ করিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন! এই স্মৃতি তো আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। সেই স্নেহের প্রহার পাবার আশায় এই পৃথিবীতে বারে বারে আমি ফিরে আসতে চাই। জন্ম জন্ম

সাধ যে আমার মায়ের কোলে আসি আবার।

আমার মনে আছে, একদিন দুপুরবেলা আমি আমার এক বন্ধুকে ডাকছি—অনিল, অনিল বলে। ভীষণ চিৎকার করে ডাকছি। স্কুলের সামার ভ্যাকেশন, অনিলদের বাড়ি থেকে একটা বই আনব! সামনের বাড়ির দরজাটা খুলে গেল। একজন সাংঘাতিক চেহারার ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তিনি এসেই কিছু না বলে আমার কানটা ধরলেন, ধরেই ঠাস্ ঠাস্ করে দু'গালে দু'টো চড়। মেরে আবার কানমলা নাকমলা। কিছুই বুঝতে পারছি না। একালের ছেলে হলে বলত যে, আমি চিৎকার করেছি তো আপনার কী। রাস্তা সকলের। আমাদের কালে সে মানসিকতা ছিল না। আমি মনে করতাম যে সত্যিই তিনি আমার জ্যাঠামশায়। এরপর তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, 'গাধা ছেলে, জানিস না চিৎকার করাটা হচ্ছে অসভ্যতা?' সেই যে শিখিয়ে দিয়েছিলেন সে-শিক্ষা আজও ভুলিনি। একটা শান্ত পাড়ায় খামোকা কারও নাম ধরে চিৎকার করাটা অসভ্যতা। এই যে সভ্যতা আর অসভ্যতার বোধ, এটা কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে নেই। সভ্যতা আর অসভ্যতা বোধটা এইভাবেই মানুষ শেখে সুসভ্য অভিভাবকের কাছ থেকে। যেমন আমার মনে আছে একবার আমার বাবা আমার খাবার ধরন দেখে রেগে আগুন। কী হল জানি না, তিনি উঠে পঙ্‌ক্তির তিনজনকে টপকে আমার কাছে এলেন। কানটা ধরে তুলে দিয়ে বললেন, যাও বাইরে যাও। কী ব্যাপার—না আমি সজনে ডাঁটা চ্যাকোর, চ্যাকোর শব্দ করে চিবোচ্ছিলাম। আমি তো বাইরে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছি। পরে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'শোনো, খাবে কিন্তু কোনও আওয়াজ করবে না।' তখন আমি আবার একটু সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, মুড়ি চিবোলে যে শব্দ হবেই। বললেন, দেখো, মুড়ি চিবোলে একটা শব্দ হবে, সেই শব্দের জন্যে প্রত্যেকের একটা মানসিক প্রস্তুতি থাকে। কিন্তু যে খাবারে মানসিক প্রস্তুতিটা শব্দের জন্য নেই সেখানে শব্দ করার মানেই হচ্ছে আর পাঁচজন যাঁরা বসে আছেন তাঁদের একটা অশান্তি সৃষ্টি করা। সেইজন্য ঢেউ করে ঢেঁকুর তোলা, যেখানে সেখানে বিকট শব্দ করে হাঁচা অসভ্যতা। সচেতন হলেই সংযত হওয়া যায়। চায়ে চুমুক দেবে, শব্দ করবে না, চায়ের কাপ নামাবে শব্দ হবে না, এও শিক্ষা, বড় শিক্ষা। তিনি বলতেন—ডোন্ট মেক ইওরসেলফ এ ন্যুইসেন্স টু আদারস। এই

শিক্ষার সঙ্গে কেমিস্ট্রি, ম্যাথেমেটিকস্-এর কোনও যোগ নেই। পরবর্তী-কালে লেখাপড়া শিখে তোমরা যখন বিদেশে যাবে তখন এই শিক্ষা ভয়ংকর কাজে লাগবে। এর নাম এটিকেট। বিদেশে গিয়ে আমরা বদনাম কুড়িয়ে ফিরে আসি। কেননা, আমরা অনেক মানবিক জিনিস, সামাজিক জিনিস মানি না। আমার এই পঞ্চাশ বছরের জীবনে আমি তিনটে জিনিস শিখেছি। (এক) লেখাপড়ার একটা দাম আছে বিশেষত অ্যাকাডেমিক লাইনে। ধরো অক্সফোর্ডে গেলে কি কেমব্রিজে গেলে—সেখানে তোমার নিজের জ্ঞানের পরিচয় অবশ্যই দিতে হবে। সেখানে তোমার চেয়েও শিক্ষিত, জ্ঞানী মানুষ থাকবেন অবশ্যই। কারণ, জ্ঞানীর জ্ঞানী আছেন, তার উপরে বিজ্ঞানী আছেন, তার উপরে প্রজ্ঞানী আছেন। জ্ঞানের জগতে শেষ বলে কিছু নেই। সীমাহীন। (দুই) দামি জিনিস হল, সভ্যতা, বিনয়, নিজের আচার-আচরণ। (তিন) সৌরভ, চরিত্রের সুগন্ধ। ঘেঁটু ফুল, মাকাল ফল হয়ে লাভ নেই।

আমাদের প্রধান শিক্ষকমহাশয় ছিলেন অদ্ভুত সুন্দর মানুষ। বাইরে থেকে দেখলে ভয় হবারই কথা। ভয়ংকর চেহারা। ভীষণ গম্ভীর। মোটা কাঁচের আড়ালে বড় বড় চোখ। পাঞ্জাবির ঝুল এত বড়, হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝুলে পড়ত। প্রথম দিন দেখে আমার এত ভয় করেছিল, তিনি যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন, আমি ভয়ে সিঁড়ির তলায় লুকিয়ে পড়েছিলুম। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। আমি সিঁড়ির তলায় গুটিসুটি মেরে বসে আছি। সেইদিন টের পেয়েছিলুম—কী অপূর্ব মজার মানুষ ছিলেন তিনি। গুটি গুটি পেছন দিকে এলেন, হাতে ছিল ছাতা। ছাতার বাঁকানো হাতল জামার কলারে লাগিয়ে ধরে টান মারলেন। জামার পেছনে টান পড়ায় ফিরে তাকাতেই বললেন, 'বেরিয়ে আয়। আমি বাঘ না ভালুক। ভয়ে লুকোচ্ছিস কেন?'

কাঁধে হাত রাখলেন। বন্ধুর মতো গল্প করতে করতে বেরিয়ে এলেন স্কুল কম্পাউন্ডে—গঙ্গার ধার। বিশাল বিশাল দুটো শিশুগাছ। আমার কাঁধে হাত রেখে পায়চারি করতে করতে বলতে লাগলেন, ভক্তি করবে ভয় করবে না, শ্রদ্ধা করবে কিন্তু প্রশ্ন করতে ভুলবে না। তোমার বাবা আর শিক্ষক, জানবে দু'জনেই সমান। এই স্কুলে তোমার পিতামহ ছিলেন নামকরা শিক্ষক। বিদ্যাসাগরের মতোই ছিল তাঁর চরিত্র।

নিরহংকারী, জ্ঞানী, পরোপকারী। কতকাল হয়ে গেছে, এই অঞ্চলের মানুষ এখনও তাঁর নাম করে। শ্রদ্ধার প্রণাম জানায়। সব সময় মনে রাখবে, তুমি সেই মহাপুরুষ যোগীনবাবুর নাতি। সব সময় অনুকরণ করার জন্যে সামনে এক জীবন্ত চরিত্র রাখবে। সংকল্প করবে আমাকে ওইরকম হতে হবে। সবটা না হলেও, কিছুটা যদি হয়, তাহলে ভাল।

আমার কাঁধে হাত রেখে প্রধান শিক্ষকমহাশয় বেড়াতে বেড়াতে সেই কতকাল আগে যে কথাগুলি বলেছিলেন, আমার মনে দাগ কেটে বসে গিয়েছিল। সেদিন একটি গল্প বলেছিলেন। সেই গল্পেই শেষ হবে এই কাহিনী :

এক বৃদ্ধ মানুষ পথের পাশে উবু হয়ে বসে একমনে কী করছেন। সেই রাজ্যের রাজা ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। বৃদ্ধকে দেখে ঘোড়ার পিঠে বসেই প্রশ্ন করলেন, 'বৃদ্ধ ! তুমি কী করছ ?'

বৃদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে রাজাকে বললেন, 'মহারাজ দেখতেই পাচ্ছেন, আমি একটি আঙুর গাছ রোপণ করছি !'

মহারাজা বললেন, 'তোমার কি ধারণা, ওই আঙুর গাছের ফল খাওয়ার মতো তোমার বয়স আছে ? কত বছর পরে ওই গাছে ফল ধরবে তুমি জানো ? তখন কি তুমি বেঁচে থাকবে ? বৃদ্ধ বললেন, 'সবই আমি জানি মহারাজ। এই গাছ আমি আমার জন্যে পুঁতছি না। এই গাছ সেই ভবিষ্যৎকালের জন্যে। আমার পরেও অনন্তকাল এই পথে হাঁটবে। তারা এই গাছের মিষ্টি আঙুর খাবে তখন। আমি তখন কোথায় মহারাজ ! দেহ চলে যাবে, থাকবে কর্ম। অজানা এক মানুষের পোঁতা একটি আঙুর গাছ। মানুষটাকে মনে রাখার প্রয়োজন নেই। ফলেই তৃপ্তি। পথিকের তৃষ্ণা নিবারণ।'

মহারাজ নেমে এলেন, অহঙ্কারের ঘোড়া থেকে। বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আপনি আমার গুরু। আমরা সবাই নিজের জন্যেই বাঁচি। সেই আমির সময়সীমা কতটুকু। তার আগেও পৃথিবী ছিল, তার পরেও পৃথিবী থাকবে অনন্তকাল। কাল আর কর্ম এই হল প্রবাহ। মানুষ নিমিত্তমাত্র।'

মহারাজ তাঁর গলার বহুমূল্য পদকটি বৃদ্ধের গলায় পরাতে গেলেন। বৃদ্ধ হেসে বললেন, 'না মহারাজ, কর্মের পুরস্কার পদক নয়।

এই যে আপনি আমাকে গুরু বললেন, তার মানে আপনি আমার ছাত্র। শিক্ষিত ছাত্রই গুরুর গলার শ্রেষ্ঠ পদক। হীরের চেয়েও দামী।'

মহারাজ তখন সেই বৃদ্ধকে প্রণাম করলেন। প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়াঃ। ছাত্রের এই হল কর্ম। সেই শিশুগাছ দুটি আজও আছে। আজও বয়ে যায় গঙ্গা। আমি বৃদ্ধ; কিন্তু প্রদীপের মতো ভেতরে জ্বলে আছে, সেই অপূর্ব শিক্ষকের দিয়ে যাওয়া শিক্ষা। পারিনি কিছুই কিন্তু জেগে আছে বিবেক।



কৃপা

প্রতি রবিবার দাদা একজোড়া জুতো খুব পালিশ করে। চামড়ার জুতো। জুতো-জোড়াটা ছিল আমার বাবার। বাবা চলে গেছেন। আজ প্রায় তিন বছর হয়ে গেল। নরম কাপড় দিয়ে পালিশ করতে-করতে এমন করে ফেলে, আয়নার মতো মুখ দেখা যায়। বাবা যে খাটটায় শুতেন তার তলায় সুন্দর একটা পিঁড়ের ওপর সাজিয়ে রাখে।

বাবা মারা যাওয়ার পর দাদাকে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছে। এ ছাড়া, আর কোনও উপায় ছিল না। দাদার খুব ইচ্ছে ছিল, অনেক লেখাপড়া করবে। বিলেত যাবে। সে আর হল না। এক মারোয়াড়ি ফার্মে চাকরি করে। দাদার স্বপ্ন হলুম আমি। দাদা বলে, 'আমার ইচ্ছে ছিল, হল না। তোকে হতে হবে। রোজ যখনই সময় পাবি, ওই জুতোর দিকে তাকিয়ে থাকবি। দেখবি একটা শক্তি পাবি।'

মাধ্যমিক পরীক্ষা এসে গেল। আর ক'দিন মাত্র বাকি। এমন একটা ভয় এল মনে। প্রথমে মনে হল, আমি পাশ করতে পারব না। তারপর মনে হল, যদিও পাশ করি কোনওরকমে করব। ভাল নম্বর পাব না। আর ভাল নম্বর না পেলে পড়াশোনা শেষ। দাদাকে আর সাহায্য করতে পারব না। সারা জীবন বেকার বসে থাকতে হবে দাদার ঘাড়ে। আমার চোখে জল এসে গেল। যতই পড়ছি, ততই সব ভুলে যাচ্ছি। আমার এই অবস্থার কথা কাউকে বলতে পারছি না। লেখাপড়ায় আমি খুব একটা খারাপ নই। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

আমাদের অবস্থা এক সময়ে খুব ভাল ছিল। মানুষের সবদিন তো ভাল যায় না। কর্মচারীরা প্রবল আন্দোলন করে বাবার কারখানাটা উঠিয়ে দিল। বাবা আর নতুন করে কিছু করতে চাইলেন না। বললেন, 'অনেককে নিয়ে বড় কিছু করার দেশ এটা নয়। হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ-কারখানা, এ-সবই বন্ধ হয়ে যাবে।' বাবার অনেক বড়-বড় স্বপ্ন ছিল। মানুষ ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে। বাবা স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পর ঘুমিয়ে

পড়লেন। যে-ঘুম কোনওদিন ভাঙে না। চলে যাওয়ার সাতদিন আগে কথায়-কথায় বলেছিলেন, 'এবার জন্মালে বিলেতে জন্মাব।' সাতদিন পরেই স্ট্রোক। দাদা বাবার ইউনিফর্ম পরে নেমে এল খেলার মাঠে। বললে, 'চলছে, চলবে। যা চলছিল সবই ঠিক সেইরকম চলবে।'

ছেলেবেলায়, দাদা যখন ছোট ছিল, ছাতে ঘুড়ি ওড়াত। আমার হাতে লাটাই। আকাশে ঘুড়ি, দাদার হাতে সুতো, সে কী চিৎকার—'দুয়ো। আমার বাজারে কেউ নেই, আমি আছি ভয় নেই।' ছেলেবেলার এই স্লোগানটাকেই একটু অন্যরকম করে নিয়ে, দাদা এখন থেকে-থেকে হুঙ্কার ছাড়ে—'আমার পাশে কেউ নেই, আমি আছি ভয় নেই।'

সকালে দমাদ্দম ডন-বৈঠক মারার পরই এই স্লোগানটা বারেবারে বেরোতে থাকে। আমাকে বোঝায়, 'জীবন কেমন জানিস? তোকে বাঘে তাড়া করেছে। তুই ছুটছিস। উঠে গেছিস পাহাড়ে। বাঘ তখনও তোর পেছনে। পাহাড়চুড়া থেকে তুই পড়ে যাচ্ছিস খাদে। পড়ে যেতে-যেতে কোনওরকমে একটা লতা ধরে ঝুলছিস। বাঘটা উঁকি মারছে। এই সময় হঠাৎ বেরিয়ে এল এক পাহাড়ি ইঁদুর, ইয়া এত বড়। ইঁদুরটা ধারালো দাঁত দিয়ে, তুই যে লতাটা ধরে ঝুলছিস, সেইটা কাটতে লাগল। তুই ঝুলছিস। নীচে গভীর খাদ। পড়ে গেলেই মৃত্যু। এমন সময় তুই দেখলি, পাশেই তোর হাতের নাগালের মধ্যে ঝুলছে এক থোলা পাকা আঙুর। বাঁ হাতে লতাটা ধরে ঝুলছিস, ইঁদুর কাটছে, মাথার ওপর বাঘ ঝুঁকে আছে, তুই ডান হাতে একটা করে আঙুর ছিঁড়ছিস আর মুখে দিচ্ছিস, নীচে গভীর খাদ হাঁ করে আছে। তোকে যেভাবেই হোক, ঝুলে থাকতে হবে। মৃত্যুর পরোয়া করি না, জীবনকে উপভোগ করি।'

আমার দাদা, সাঙ্ঘাতিক দাদা। বাবাকে ভীষণ ভালবাসত। বাবাই তার গুরু। বাবার সমস্ত জিনিস, বাবার ঘরে এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে, যেন বাবা বাথরুম গেছেন। এখনই এসে জামাকাপড় পরবেন, চশমাটা চোখে দেবেন, জুতো পরে হাতে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে যাবেন। দাদা বাবার ঘরে কাউকে শুতে দেয় না। বলে, 'বাবার মন্দির।' ঘরের সংখ্যা কম। আমরা দু ভাই বারান্দায় শুই। দাদা বাবার বিছানায় মশারি ফেলে ভাল করে গুঁজে, মাথার কাছে ছোট টেবিলে এক গেলাস জল চাপা দিয়ে রাখে।

দাদাকে মনে হয়, আমার বাবা। ছোট বাবা। বাবা যেমন রোজ রাতে দাদাকে পড়াতে বসতেন, দাদাও আমাকে নিয়ে সেইরকম বসে। বাবার মতো মুখ, চোখ, কপাল, খাড়া নাক এমনকী, গলার আওয়াজও। পরীক্ষা যেদিন শুরু হবে, তার আগের রাতে, দাদা আমাকে নিয়ে বসেছে। বলছে, 'সব একবার রিভাইস করে নে।'

আমি কেঁদে ফেললুম, 'দাদা, আমার কিছু মনে নেই। সব ভুলে গেছি। আমি বসে-বসে ফেল করব।'

দাদা কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে রইল। তারপর হঠাৎ যেন আগুনের মতো জ্বলে উঠল। কোনও বাধা পেলেই দাদা যেমন হয়ে যায়। বাবার নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ। বাবার সামনেও কোনও বাধা এলে, বুক চিতিয়ে বলতেন, 'আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ, সারেন্ডার নট। আত্মসমর্পণ করব না।'

দাদা আমার কাঁধে একটা ঝাঁকুনি মেরে বললে, 'তুই সারেণ্ডার নট-এর ছেলে হয়ে এই কথা বলছিস! আয় আমার সঙ্গে।'

দাদাকে অনেকটা মহাদেবের মতো দেখতে। আমাকে টানতে-টানতে বাবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বললে, 'বোস মেঝেতে, বাবু হয়ে।'

বসলুম। একসঙ্গে চার-পাঁচটা ধূপ জ্বেলে বাবার ছবির সামনে রাখলে। ছবিটা খাটে। ধূপদানিটা সামনের টুলে। মৃদু একটা আলো জ্বেলে দিলে। খাটের তলায় চোখের সামনে বাবার জুতো-জোড়া। ঝকঝক করছে। ছোট্ট একটা আসনের ওপর।

দাদা আমার পাশে বসল। প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে। বললে, 'বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে থাক বেশ কিছুক্ষণ। চোখের পাতা ফেলবি না।'

একভাবে তাকিয়ে আছি। জল আসছে চোখে। বাবার হাসি-হাসি মুখ বসে আছেন চেয়ারে। গায়ে একটা কাশ্মীরি শাল। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তোলা। সেই ছবিটাই বড় করা হয়েছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মনে হল, ছবিটা জীবন্ত। চোখের পাতা পড়ছে। ঠোঁট নড়ছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। কেমন যেন ঘোর লেগে যাচ্ছে। সব ঝাপসা হয়ে আসছে। হঠাৎ খটখট জুতোর শব্দ কানে এল। যে-ঘরে বসে ছিলুম, সেটা যেন নিমেষে মিলিয়ে গেল। লম্বা, সোজা একটা রাস্তা। দু'পাশে সার সার বিশাল-বিশাল গাছ। বহু দূরে আকাশের

গায়ে নীল একটা পাহাড়। জল চিকচিক একটা নদীর রেখা।

আমার সামনে সোজা হয়ে হেঁটে চলেছেন বাবা। আমি তাঁর শক্ত পায়ের গোছ দেখতে পাচ্ছি। গোড়ালিটা ঢুকে গেছে চামড়ার তৈরি ঝকঝকে জুতোর মধ্যে। বাবার হাঁটার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। কখনও পা ভাঙত না হাঁটুর কাছ থেকে। সৈনিকের মতো চর্চা করতেন। চিবুকটা থাকত খাড়া। যেন খাপখোলা একটা তলোয়ার হেঁটে চলেছে। আর হাঁটতেন খুব দ্রুত গতিতে।

আমি, আমার দাদা, দু'জনে প্রায় ছুটছি। তাল রাখতে পারছি না। জুতোর ভয়ংকর শব্দ আমাদের আগে-আগে চলেছে। কাঁকুরে পথ। শেষবেলার রোদ লুটিয়ে আছে, গাছের ফাঁক দিয়ে যেখানে-যেখানে আসতে পেরেছে। 'বাবু' বলতুম আমি বাবাকে। দাদা 'বাবা'ই বলত। বাবার জুতোর গোড়ালির চাপে ছোট-ছোট কাঁকর গুঁড়িয়ে পাউডার হয়ে যাচ্ছে। মশর-মশর শব্দের সঙ্গে জুতোর গোড়ালির শব্দ।

বাবার চওড়া পিঠ। সুন্দর মাথা। শক্ত ঘাড়। ব্যায়াম করা শরীর। আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন না। কেবল এক একবার বলছেন, 'ঠিক আসছ তো, ঠিক আসছ তো।'

আমরা প্রায় ছুটছি। আমাদের নজর বাবার পায়ের দিকে। সুন্দর দুটো পা। কালো কুচকুচে জুতো। সমান-সমান দূরত্ব রেখে একটার-পর-একটা পড়ছে। আর বিশাল লম্বা একফালি কাপড়ের মতো পথটা গুটিয়ে যাচ্ছে। আমার পায়ে ভোঁতা-মুখ ছোট্ট একজোড়া বুট। আমাদের জুতোর ঠোক্করে, ছোট-ছোট সাদা মসৃণ পাথর ঠিকরে চলে যাচ্ছে।

উল্টো দিক থেকে বাতাস বইছে জোরে। বাবার মাথার পেছন দিকের বড়-বড় চুল উড়ছে। আমাদের কপালে চুল খেলা করছে। হঠাৎ পেছন দিক থেকে একটা টাঙা আমাদের অতিক্রম করে সামনে চলে গেল। সাদা ঘোড়ার পায়ের টগবগ শব্দ। নুড়িপাথরের ওপর দিয়ে চাকার কেটে-কেটে চলে যাওয়ার অদ্ভুত আওয়াজ। পেছন দিকে তিন-চারজন যাত্রী। তাদের মধ্যে একজন সিল্কের রুমাল নাড়ছে। টাঙাটা ক্রমশ দূর থেকে দূরে একটা দেশলাইয়ের খোলের মতো হয়ে গেল। পথটা যেন নাড়া খেল। নির্জন, আরও নির্জন হল। সাদা স্বাস্থ্যবান ঘোড়াটা বাবার হাঁটার শক্তি যেন আরও বাড়িয়ে দিল।

আমি মাথা নিচু করে, হাত মুঠো করে সারা শরীর দুলিয়ে হাঁটছি।

আমার চোখ আমার ছোট পায়ের ছোট জুতোর দিকে। পথের সাদা কাঁকরের দিকে। মাঝে-মাঝে চোখ যাচ্ছে বাবার পায়ের দিকে। কী গতি, কী শক্তি। টাঙার বড়-বড় লোহার চাকাও হেরে যায়। আমাদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে বাবার একটা যেন রেস চলেছে। আকাশের গায়ে নীল পাহাড়টাকে অনেক বড় দেখাচ্ছে। নদীর সুতো এখন চওড়া ফিতে। বাবা পাহাড় ভীষণ ভালবাসতেন। পাহাড়টাকে ধরার জন্য যেন ছুটছেন। আমি ঘেমে গেছি। আমার ছোট-ছোট পা দুটো যেন আর চলছে না। হঠাৎ আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম মুখ থুবড়ে। দাদা বলছে, 'রাজা পড়ে গেছে। রাজা পড়ে গেছে।' বাবা অনেকটা দূরে ছিলেন। আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন গটগট করে। আমি দেখতে পাচ্ছি কালো জুতো। পাউডারের মতো ধুলো জমেছে। বাবা সামনে এসে আমাকে তুলতে-তুলতে বলছেন, 'পড়ে গেছে তো কী হয়েছে? এই তো আবার উঠে পড়েছে।'

আমার হাঁটু দুটো ছড়ে গেছে। দাদা বলছে, 'কেটে গেছে।'

বাবা বলছেন, 'ও অমন অনেক কাটবে ছিঁড়বে। সামনেই নদী। পাহাড়ি নদীর জল ওষুধের মতো। ওখানে গিয়ে ধুয়েমুছে দেব।'

আবার আমাদের হাঁটা শুরু হল। বাবার সেই এক গতি। আমার হাঁটুর কাটা থেকে অল্প-অল্প রক্ত ঝরছে। এক সময় বললুম, 'বাবা, আমি যে আর পারছি না।'

বাবা থেমে পড়লেন। আমার দিকে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে বললেন, 'পারছ না মানে! তুমি ওই নীল পাহাড়ে যাবে না?'

'আমার শরীর আর পারছে না।'

'শরীর নয়, তোমার মন। তোমার মন হেলে গেছে। তুমি হেরে যাবে? যারা টাঙা করে গেল তারা এতক্ষণে নদী পেরিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেছে। ওই পাহাড়ের চূড়ায় নানা রঙের পাথর পাওয়া যায়। এক-একটার রং প্রজাপতির পাখার মতো। আর পাথরের ফাটলে-ফাটলে আছে তুলো ঘাস। এত কাছে এসে তুমি বলছ, পারবে না। ওদের কাছে তুমি হেরে যাবে!'

দাদা বলছে, 'বাবা, আমরাও তো টাঙায় যেতে পারতুম।'

বাবা বলছেন, 'ও তো দুর্বলের যাওয়া, সবল যায় পায়ে হেঁটে। হাঁটার একটা আলাদা আনন্দ আছে। সব জিনিসই জয় করে নিতে হয়।

কষ্টের পর যে বিশ্রাম, তার আনন্দ অনেক বেশি। হারি আপ, হারি আপ মাই বয়েজ। সূর্য ডোবার আগে আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে। কেন পারবে না! বীর কখনও হারে না।'

আবার আমাদের হাঁটা শুরু হল। পথ ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। গাছ সরে যাচ্ছে। নদী এগিয়ে আসছে। পাথর আরও বাড়ছে। এইবার বড়-বড় পাথর। সাদা দুধের মতো, হালকা সবুজ-লালের ছিট। ক্রমশই ঢালু হচ্ছে পথ। একসময় শুধুই পাথর। টাঙাটা একপাশে দাঁড়িয়ে। আর এগোতে পারেনি। চালক ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে, একপাশে বসে আছে উদাস হয়ে।

বাবা বলছেন, 'দেখছ, অন্যের কাঁধে চড়ে, কিছুদূর যাওয়া যায়, শেষপর্যন্ত যেতে হলে নিজের শক্তিই ভরসা।'

বাবা এইবার পাথর থেকে পাথরে লাফ মেরে চলেছেন। কী ব্যালান্স। জুতোর শব্দ হচ্ছে খটাস-খটাস। গোড়ালির পেরেকের সঙ্গে পাথরের কোণা লেগে সিগারেট লাইটারের মতো আগুনের ফিনকি ছুটছে।

নানা মাপের অত পাথর, দিগন্তবিস্তৃত অত পাথর দেখে চোখে ঘোর লেগে যাচ্ছে।

বাবা বলছেন, 'শরীরটাকে পাখির মতো হালকা করে দাও। মনে করো তোমায় ডানা আছে। ভাবলেই হবে। মানুষ সব পারে, মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই।'

আমরা আরও ঢালু বেয়ে একেবারে নদীর বুকে নেমে এলুম। জল বেশি নয়, কিন্তু ভীষণ স্রোত। কাচের মতো জল। একবারে তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ছোট-বড় পাথর, বালির দানা কিচকিচ করছে। বাবা পকেট থেকে রুমাল বের করে জলে ভিজিয়ে, আমার হাঁটুর থেঁতলে যাওয়া জায়গা দুটোয় থুবে থুবে, আলতো করে লাগালেন। সব ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল। হাতে লেগেছিল। সেই জায়গাগুলোও মেরামত করলেন।

জিজ্ঞেস করছেন, "কী, খুব জ্বালা করছে?"

করছে। তবু আমি বললুম, 'না না, ঠিক আছে।'

বাবা, খুশি হয়ে বলছেন, 'বাঃ ভেরি গুড! এই তো ট্রেনিং। কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা, আমাদের জীবনের সঙ্গী। একদম পাত্তা দেবে না। তা হলেই সব কাবু হয়ে যাবে। এখানে হাঁটতে এসেছ, হেঁটে যাও। থামবে

না, থেমে পড়বে না, ভেঙে পড়বে না। এই হল পথ, তুমি হলে পথিক। আর এই জুতো হল গতি। দ্যাখো না, আমি কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছি। আর হ্যাঁ, জুতো হল আত্মবিশ্বাস। এই দ্যাখো, পেছনে তাকাও।'

আমি ফিরে তাকালুম। অবাক কাণ্ড। দেখি একটা ঘর, দালান। চারপাশে আমগাছ, জামগাছ, লিচুগাছ। সকালের রোদ। পাখি ডাকছে। দালানে একটা দোলা। একেবারে এতটুকু একটা শিশু দোলায় শুয়ে হাত-পা নাড়ছে। ছোট্ট লাল-লাল কচি-কচি দুটো পা। বাবার গলা। তিনি বলছেন, 'চিনতে পারছ? তোমার বাবা।'

আমি বাবার দিকে ফিরে তাকালুম। আশ্চর্য! ওইদিকটায় সেই খরস্রোতা নদী। নীল পাহাড় খাড়া হয়ে উঠে গেছে আকাশের দিকে।

বাবা বলছেন, "আবার দ্যাখো।"

একজন কিশোর গ্রামের পথ ধরে স্কুলে যাচ্ছে। বগলে বই।

বাবা বলছেন, 'বাড়ি থেকে দেড মাইল দূরে ছিল তোমার বাবার স্কুল। রোজ হেঁটে যেত, হেঁটে ফিরত। তাই তো আমি এখনও এত হাঁটতে পারি। একদিনও কামাই হত না। টিফিন ছিল ছোলা ভিজে আর আদা। একটু নুন।'

ফুর-ফুর করে বাঁশি বাজল। নিমেষে দৃশ্য বদলে গেল। খেলার মাঠ। লাল জার্সি-পরা একটি ছেলে দুর্দান্ত খেলছে। গোল। হাততালি। খেলা-শেষের বাঁশি। ভারিক্কি চেহারার এক ভদ্রলোক ছেলেটির হাতে একটা বড় কাপ তুলে দিচ্ছেন। লাল জার্সি-পরা ছেলেটি মাথায় কাপ নিয়ে বেরিয়ে আসছে মাঠ থেকে। হৈ হৈ উল্লাস।

বাবা বলছেন, 'আমাদের স্কুল ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ন হল। আমাদের সময় পড়া আর খেলা। দুটোই ছিল।'

একটা ঘর। জানলার ধারে একটা টেবিল। টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। এক যুবক বই খুলে গভীর মনোযোগে পড়ছে। টেবিল-ক্লকে রাত দুটো। যুবকের গায়ে গেঞ্জি। ভীষণ ভাল স্বাস্থ্য। টেবিলের ওপর ডান হাত। হাতের গুলি ঠেলে উঠেছে।

বাবা বলছেন, 'কলেজ হস্টেল। কাল থেকে শুরু হচ্ছে বি. এস-সি পরীক্ষা। ওই ছেলেটি জীবনের কোনও পরীক্ষাকেই ভয় পায়নি কোনওদিন। সারারাত পড়বে। ভোরবেলা....'

ঠিংঠাং শব্দ। জিমনাশিয়াম। যুবক একা বারবেল ভাঁজছে। ভোরের আকাশ। দূরে একটা পার্ক। জল টলটলে দিঘি।

বাবা বলছেন, 'দেহচর্চায় শুধু দেহ বড় হয় না, মনও বড় হয়। মনের সব ভয় কেটে যায়।'

দৃশ্য বদল হল। বিশাল একটা বাড়ি। বড়-বড় থাম। অনেক সিঁড়ি। সুন্দর সেই যুবক কালো গাউন পরে ধাপে-ধাপে নেমে আসছে। হাতে গোল করে গোটানো একটা কাগজ।

বাবা বলছেন, 'ওই দ্যাখো, সিনেট হল। তোমার বাবা কনভোকেশান থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসছে। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। তোমার বাবার কাঁধে যিনি হাত রাখছেন, তিনি তোমার ঠাকুরদা। ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বড় উকিল ছিলেন। তোমার ঠাকুরদার মুখের ভাবটা দ্যাখো, যেন কোহিনুর পেয়েছেন। পিতার জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ পুত্রের সাফল্য। ছেলের মধ্যেই বাবা বেঁচে থাকেন। অনন্তকাল ধরে এই হয়ে আসছে। তোমার সাফল্যেই আমার সাফল্য'। তুমি আমাকে আনন্দ দিলে তবেই আমি আনন্দ পাব। জানবে মানুষের পা হাঁটে না, হাঁটে মন, পায়ের সাহায্যে। কোনও জিনিস হাত ধরে না, ধরে মন। দেহ বড় হয় না, বড় হয় মন। ইচ্ছে করলে মানুষ আকাশের চেয়েও বড় মন করতে পারে। পৃথিবীর সব কিছু দুর্বল। ইচ্ছাই প্রবল। সব চেয়ে শক্তিশালী হল মানুষের ইচ্ছে।'

হঠাৎ সব অদৃশ্য। কেউ কোথাও নেই। শুধু বড়, ছোট পাথর। পাহাড়ি নদীর বয়ে চলার কুলুকুলু শব্দ। একটা পাথরের ওপর বাবার জুতো-জোড়া। চকচকে কালো জুতো। মিহি পাউডারের মতো ধুলো। নদীর ওপারে সেই নীল পাহাড়। খাড়া উঠে গেছে আকাশের দিকে। কান ছুঁয়ে শাঁ-শাঁ শব্দে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। নদীর তরতরে জল পাথরে-পাথরে গান শুনিয়ে যাচ্ছে, আমরা চলেছি, চলেছি, আমরা থেমে নেই।

ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। আলো কমে আসছে। নীল পাহাড় ধূসর হয়ে গেছে। পৃথক-পৃথকভাবে আর কোনও কিছুই চেনা যাচ্ছে না, সব একাকার।

চিৎকার করলুম, 'বাবা।'

প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতেই পাহাড়চূড়া থেকে উত্তর এল, 'রাজা।'

স্লেট-পাথরের মতো আকাশ, দৈত্যের মতো পাহাড়, দুধের মতো

নদী, একেবারে চূড়ায় সাদা হাঁসের মতো এতটুকু একজন মানুষ, "রাজা, আমি এইখানে। তুমি নদীর বাধা পেরিয়ে চলে এসো। এখানে এলে তুমি দূর, দূর, কত দূর দেখতে পাবে। মিছরির মতো মিষ্টি বাতাস। কতরকমের পাথর ছড়িয়ে আছে এখানে। কোনও-কোনও পাথরে, সোনার আঁচড়।"

"ভীষণ অন্ধকার।"

"মনের মশাল জেবলে নাও।"

"নদীতে ভীষণ স্রোত।"

"মনের ভেলা ভাসাও।"

"পাহাড় ভীষণ উঁচু।"

"মনের মই তার চেয়ে উঁচু।"

"আমার পা চলছে না।"

"আমার পৃথিবী-ঘোরা জুতোটা পরে নাও।"

"আমার দাদা কোথায়?"

ঠিক আমার পাশ থেকে উত্তর এল, "তোর পাশে।"

ঘোর কেটে গেল। বিছানায় বাবার ছবি। সামনেই কালো চকচকে জুতো। দাদা রোজ অফিসে বেরোবার আগে প্রণাম করে। আমি কোনওদিন করি না। জুতোয় মাথা ঠেকালুম। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল, শুধু জুতো নয়, জীবন্ত দুটো পা এসে গেছে। জুতোটা গরম।

দাদা বলছে, "আর কোনও ভয় আছে রাজা?"

"না, দাদা, আমি পেয়ে গেছি।" অনেকদিন পরে কাঁদছি আমি।

দাদা বলছে, "রাজা, জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া হল কৃপা।"



কান ধরে তুমি

গরমের ছুটি পড়ে গেছে। আর পায় কে ! এখন দিনকতক শুধু খেলা। তারপর ছুটি যত শেষ হয়ে আসবে, পড়ার চাপ বাড়বে। বেলা তিনটের সময় চিঙ্কুর বন্ধুরা সব এসে গেল। শুরু হল চোর-চোর খেলা। শহরের এদিকটায় এখনও মাঠ-ময়দান কিছু আছে। বাগান আছে। আর আছে ফুড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের বিশাল একটা গোডাউন।

চোর-চোর খেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল, কে কত ভালভাবে লুকোতে পারে। নিজেকে লুকিয়ে ফেলাটাই হল সবচেয়ে বড় কায়দা। চিঙ্কু রাতে শুয়ে-শুয়ে প্ল্যান করে, কীভাবে, কোথায় লুকোবে। এমন লুকনো লুকোবে, জীবনে কেউ আর খুঁজে পাবে না। যে চোর হবে, সে খুঁজেই যাবে, চিঙ্কুকে আর খুঁছে পাবে না। চিঙ্কু ভাবে ; কিন্তু পথ খুঁজে পায় না। যেখানে লুকোয়, সবার আগে সে-ই চোর হয়। গভীর দুঃখ নিয়ে চিঙ্কু একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্ন দেখে, ঝোপের আড়ালে বিশাল এক সুড়ঙ্গ। চিঙ্কু তার মুখটা খুঁজে পেয়েছে। নামছে তো নামছেই। হাঁটছে তো হাঁটছেই। একটুও ভয় করছে না তার। অল্প-অল্প আলো, কিন্তু সব দেখা যাচ্ছে। সুড়ঙ্গের ভেতরে অনেক অলিগলি। একটা থেকে আর-একটায় ঢুকে পড়ছে চিঙ্কু। শেষে সে একটা চমৎকার খুপরিতে এসে হাজির হল। কী চমৎকার লুকোবার জায়গা। বিশু চোর হয়েছে। দেখি, এইবার কেমন করে খুঁজে বের করতে পারে।

স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে গেল। সকালে উঠে স্বপ্নে দেখা ঝোপের কাছে গিয়ে দেখল, কোনও সুড়ঙ্গ নেই। একটা ঢিবি। গোলমতন একটা পাথর পড়ে আছে। পাশ দিয়ে ছোট-ছোট গাছ উঁকি মারছে। চিঙ্কুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। স্বপ্ন কেন সত্য হয় না !

গোনা শেষ হয়ে গেল। উবু, দশ, কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশ····। সেই বিশুই চোর হল। স্বপন তার চোখ টিপে ধরল। সবাই ছুটল লুকোতে। হঠাৎ চিঙ্কুর মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল।

গোডাউনের বিশাল গেটটা খোলা। দুটো লরিতে জিনিস বোঝাই হচ্ছে। লোকজন চলাফেরা করছে। চিংকু টুক করে গোডাউনে ঢুকে পড়ল। কেউ তাকে লক্ষ করল না। সবাই যে-যার কাজে ব্যস্ত। চিংকু বস্তার ডাঁইয়ের আড়ালে-আড়ালে আরও ভেতরে চলে গেল। বিশাল ব্যাপার। গোডাউনটা কত বড় চিংকুর কোন ধারাণাই ছিল না। শেডের পর শেড। শুধু বস্তা আর বস্তা। এত বস্তা সে কখনও দেখেনি।

অনেকটা যাওয়ার পর চিংকু একটা ঘর পেয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই। কোনও এক সময় অফিস-টফিস ছিল। বেশ ঘুপচিমতো ঘর। আনন্দে চিংকুর মনটা নেচে উঠল। এই তো এতদিনে পেয়েছে মনের মতো লুকোবার জায়গা। চিংকু একেবারে কোণের দিকে আড়াল খুঁজে বসে পড়ল। একটু ধুলো-টুলো ছিল। তা থাক। ওসব গ্রাহ্যই করল না। মনের মতো একটা জায়গা পাওয়ার আনন্দে সব ভুলে গেল। দূর থেকে নানারকম আওয়াজ ভেসে আসছে। মানুষের কথা। লরির স্টার্ট নেওয়ার শব্দ। বাইরে দিনের আলো ক্রমশই ম্লান হয়ে আসছে। চিংকু বসেই আছে চোরের মতো। বসে-বসে ভাবছে চোর বিশু কেমন হন্যে হয়ে খুঁজছে। খুঁজে-খুঁজে বেচারা হয়রান হয়ে যাচ্ছে, কী মজা!

ঘরের ভেতর আর একটুও আলো নেই। কোণে-কোণে তলতলে অন্ধকার জমে উঠেছে। বাইরেটা নির্জন হয়ে গেছে। কারও গলা শোনা যাচ্ছে না। লরির শব্দ নেই। চিংকুর এইবার ভয় করছে। রাত হয়ে গেল। আর তো কেউ তাকে খুঁজতে আসবে না। সবাই তো বাড়ি গিয়ে পড়তে বসে গেছে। তার মাস্টারমশাইও তো এসে বসে আছেন স্কুল থেকে। বাড়িতে এতক্ষণে খোঁজাখুজি শুরু হয়ে গেছে। আজ বরাতে ধোলাই নাচছে। রাম ধোলাই। বাবা ভয়ংকর রাগী মানুষ। মনে হওয়া মাত্রই চিংকু উঠে দাঁড়াল। চিঁক-চ্যাঁক শব্দ করে কী একটা জন্তু ছুটে গেল। বেশ বড় মাপের একটা ছুঁচো।

চিংকু ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশে তারা ফুটে গেছে। কুমড়োর মতো একফালি চাঁদ। চাল আর গমের তাগড়া-তাগড়া বস্তা। কিছু বাইরে, বেশিরভাগই সার-সার গুদামঘরের ভেতরে। সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। ধেড়ে-ধেড়ে ইঁদুর নাচছে। ছুঁচোদের কীর্তন। চাল আর গমের বস্তার পাঁচিল তৈরি হয়ে আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সব গেল কোথায়! এই তো একটু আগেও সবাই ছিল।

প্রথমে মনে হল, গলা ছেড়ে কাঁদে। তারপরে মনে হল, তেমন ছোট তো আর নেই। ক্লাস সেভেনে পড়ে। ইনফ্যান্ট ক্লাসের ছেলেদের মতো কাঁদাটা কি ঠিক হবে! তা ছাড়া চাল আর গমের বস্তা ছাড়া কে আর শুনবে সেই কান্না?

চিঙ্কু ছুটল গেটের দিকে। ওখানে বেশ বড় পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে। যেন আশার আলো। অকারণেই ভয় পাচ্ছে। গেট দিয়ে যেমন ঢুকেছিল, সেইভাবেই বেরিয়ে যাবে। ভয় একটাই, বাড়ি যাওয়া মাত্রই বকুনি শুরু হবে। দু-এক ঘা চড়চাপড় পড়বেই।

গেটের কাছে গিয়ে ইলেকট্রিক আলো জ্বললেও, আশার আলো একেবারেই নিবে গেল। বিশাল গেট বন্ধ। দারোয়ান-টারোয়ান কেউ নেই। গেটের পাশেই ছোট্ট একটা গুমটি ঘর। সেখানে একটা টুল ছাড়া কিছুই নেই। চিঙ্কু গল্পে পড়েছিল, রোজ একটা বনের পথ ধরে তারই মতো এক বালককে পাঠশালায় যেতে হত। তার নাম ছিল জটিল। জটিল রোজই মাকে বলত, 'মা, আমার ভীষণ ভয় করে।'

মা বলেছিলেন, 'ভয় কী বাবা! বনের পথে তোমার মধুসূদনদাদা আছেন। ভয় করলে তাঁকে ডাকবে।' বনের পথে যাওয়ার সময় জটিলের ভীষণ ভয় করে উঠল। সে ডাকতে লাগল, "কোথায় আমার মধুসূদন-দাদা? কোথায় তুমি! শিগগির এসো। আমার ভীষণ ভয় করছে।" সঙ্গে-সঙ্গে রাখালের রূপ ধরে মধুসূদনদাদা এলেন। জটিলকে পার করে দিলেন, বনের পথ।

চিঙ্কুর সেই কাহিনীটা মনে পড়ল। মধুসূদনদাদা যদি বনের পথে আসতে পারেন, তিনি এই গুদামেও আসতে পারেন। এ তো অনেক সহজ জায়গা। বাইরে পিচের রাস্তা, ইলেকট্রিক আলো। বাঘ-ভালুক নেই। বড়-বড় ইঁদুর আর ছুঁচো আছে। তারা আর কী করবে! মধুসূদনদাদার ক্ষমতা কি কম?

চিঙ্কু বিশাল লোহার গেটটা দু' হাতে প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলে দেখল। ঘটাং করে একটা শব্দ ছাড়া আর কিছুই হল না। মনে হল, বাইরে বিশাল একটা তালা ঝুলছে। শব্দটা এত জোর হল, চিঙ্কু ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। বিশু তো খেলার চোর হয়েছিল। এখন তো সেই চোর। গুদামের লোকেরা যদি ভাবে, সে চাল আর গম চুরি করার জন্য গুদামে ঢুকেছিল!

চিঙ্কু কান্নাজড়ানো গলায় ডাকল, "মধুসূদনদাদা, তুমি কোথায়? শিগগির এসো।" চিঙ্কু বারবার বলতে লাগল। বিশাল একটা ইঁদুর তিনপাক নেচে গুমটি ঘরে ঢুকে টুলটাকে নাড়িয়ে দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে এসে চিঙ্কুর পায়ের ফাঁক দিয়ে ছুটে গেল। চিঙ্কু তিড়িং করে এক লাফ মারল। মধুসূদনদাদা কি ইঁদুরের রূপ ধরে এলেন! সেরকম কথা তো লেখা ছিল না বইয়ে। মধুসূদনদাদা তো শ্রীকৃষ্ণ! তিনি কেন যাচ্ছেতাই একটা ইঁদুর হতে যাবেন!

চিঙ্কুর হঠাৎ মনে হল, তার ভুল হয়েছে। 'তুমি' বলাটা ঠিক হয়নি। তখন সে আবার ডাকল, "মধুসূদনদাদা, আপনি কোথায়? একবার আসুন। আমার ভয়ঙ্কর ভয় করছে। মধুসূদনদাদা গো।" চিঙ্কু একটা বাড়তি গো যোগ করল। তাতে যদি একটু কাজ হয়! কিছুই হল না। পেল্লায় গেট যেমন ছিল সেইরকমই রইল। গেটের তুলনায় বালক চিঙ্কু খুবই ছোট। পুতুলের মতোই। গেটের মাথার ওপরে আলোটা খুবই জোরালো। সেই আলোর গেটের মুখটা ফটফট করছে। ডানা মেলে গোটাকতক পোকা আলোর কাছে উড়ছে। ডানাগুলো চিকচিক করছে।

চিঙ্কু একবার মধুসূদন বাদ দিয়ে, শুধু দাদা, দাদা বলে চিৎকার করতে লাগল। বইয়ের মধুসূদনদাদা বইয়ের গল্পতেই দেখা দেন। চিঙ্কু ডাকতে লাগল গুদামের দাদাকে। যদি কেউ কোথাও থাকেন। বস্তার আড়ালে লুকিয়ে। কোথায় কে? দরোয়ানরা বোধ হয় সিনেমা দেখতে চলে গেছেন।

গেটের বাইরে রাস্তা। একেবারেই নির্জন। কোনও মানুষের পায়ের শব্দ নেই। কথার আওয়াজ নেই। হাঁচি কি কাশি। একটা কীর্তনের দল এগিয়ে আসছে। চিঙ্কু যেন আশার আলো দেখতে পেল। কাছাকাছি এলেই চিৎকার করবে। পথের ওপর বস্তা ফেটে পড়ে যাওয়া অনেক চাল আর গম ছড়িয়ে ছিল। চিঙ্কু একমুঠো তুলে নিল। কেউ শুনতে না পেলে গেটের মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে মারবে।

শুধু কীর্তন নয়। সঙ্গে মৃতদেহ। গম্ভীর গলায় হরিধ্বনি—বলো হরি, হরি বোল। সঙ্গে ঝাঁই ঝাঁই কীর্তন। চিঙ্কু ভয় পেয়ে গেল। হরি বোল শুনলেই তার ভীষণ গা ছমছম করে। তবু চিঙ্কু সাহস করে হাতের মুঠোয় ধরা চাল আর গম গেটের ওপর দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল। ছিটছাট শব্দটাও তার কানে এল শোরগোলের ফাঁকে। ফল হল উল্টো।

ভূত ভেবে গোটা দলটাই ছুটে পালাল। তারা যে ছুটছে এটা বেশ বোঝা গেল। আবার রাস্তা সুনসান। গেটের সামনে অসহায় চিংকু, মাথার ওপর আলো, পায়ের কাছে ছায়া।

উত্তর দিকে অনেকটা দূরে গুদামের উঁচু পাঁচিল যেখানে শেষ হয়েছে তার গায়েই একটা বাড়ি। একতলাটা দেখা যাচ্ছে না। পাঁচিলের আড়ালে। দোতলাটা ঝুলছে; কিন্তু অন্ধকার। বারান্দায় সাদামতো কী একটা ঝুলছে! হঠাৎ দোতলার ঘরে আলো জ্বলে উঠল। চিংকু প্রায় দৌড়ে সেদিকটায় গেল। গুদামের ওইদিকটা আগাছায় ভর্তি। কপ করে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ল পায়ের কাছে। ভয় পেলে চলবে না।

বাড়িটার কাছাকাছি গিয়ে চিংকু চিৎকার করল, 'মাসিমা, মাসিমা।'

এক বৃদ্ধা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। দোতলার একচিলতে আলো এসে পড়েছে। চিংকু সেই আলোয় দাঁড়িয়ে আছে। বুদ্ধি করে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে সেখানে। বৃদ্ধা বললেন, 'কে? কে ওখানে?'

পাকা চুল। চিংকুর মাথায় এসে গেল, আর মাসিমা বলা ঠিক হবে না, ঠাকুমা বলাই উচিত। চিংকুর একটু সাহস আসছে। মানুষ তো দেখা গেছে! চিংকু বললে, 'ঠাকুমা, আমি এখানে আছি।'

বৃদ্ধা বললেন, 'যাও, শুয়ে পড়ো। অনেক রাত হয়ে গেছে। আমরাও এইবার শুয়ে পড়ব।'

চিংকু বলল, 'ক'টা বাজল ঠাকুমা?'

'সাড়ে ন'টা। তোমার খাওয়া হয়ে গেছে?'

চিংকুর সন্দেহ হল, ঠাকুমা তাকে অন্য কারও সঙ্গে গোলমাল করে ফেলেছেন। চিংকু জিজ্ঞেস করল, 'আমি কে ঠাকুমা?'

'মজা হচ্ছে! ভাবছিস ছানি পড়েছে বলে দেখতে পাচ্ছি না? তুই তো গোলোক?'

'না ঠাকুমা, আমি এখানে আটকে গেছি। আমার নাম চিংকু।'

'আটকে গেছিস মানে? তুই তো ছাড়াই আছিস।'

'গেটে একটা বিরাট তালা ঝুলিয়ে ওরা চলে গেছে।'

'তাতে তোরই বা কী, আর আমারই বা কী?'

'আমি যে বাড়ি যাব ঠাকুমা।'

বৃদ্ধার পাশে বেশ বলশালী এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। চিংকুর দিকে তাকিয়ে একটা ধমক দিলেন, 'চুরি করতে ঢুকেছিস?'

চিংকু কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, 'জ্যাঠামশাই, আমার বাবার নাম প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি চোর হব কেন? চোর-চোর খেলার সময় লুকোতে ঢুকেছিলুম।'

'কোন প্রকাশচন্দ্র!'

'ওই যে, উচ্চ বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারমশাই।'

'কোন বিদ্যালয়।'

'বিন্ধ্যবাসিনী মহাবিদ্যালয়।'

ভদ্রলোক একটু নরম হলেন, 'ও, তুমি তাঁর ছেলে? আমাকে জ্যাঠামশাই বানিয়ে দিলে?'

'জ্যাঠামশাই, আপনি আমাকে বের করে দিন। সাড়ে ন'টা বেজে গেল।'

'সাড়ে ন'টা? এখন তো সাড়ে আটটা।'

'ঠাকুমা বললেন যে!'

ভদ্রলোক বৃদ্ধাকে বললেন, 'মা, তোমাকে কতবার বলেছি নীচের ঘড়িটা দেখবে না। ওটার মাথা খারাপ।'

চিংকু বললে, 'সাড়ে আটটাও অনেক রাত জেঠু। বাড়িতে কী হচ্ছে সে আমিই জানি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'মার হবে?'

'সে আর বলতে।'

'স্যারের মেজাজ সেই আগের মতোই আছে?'

'হ্যাঁ। আরও খারাপ হয়েছে।'

ভদ্রলোক মনের আনন্দে গল্প শুরু করে দিলেন। চিংকু এদিকে আগাছার জঙ্গলে খাড়া। কটর-কটর করে বিশ্রী মেজাজের একটা ব্যাঙ ডাকছে। ছ্যাট-ছ্যাট করে উচ্চিংড়ে জাতীয় পোকা ছিটকে এসে মুখে, গলায় হোঁচট খেয়ে ঝোপের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে।

ভদ্রলোকের হঠাৎ মনে হল, ছেলেটাকে উদ্ধার করা দরকার। ঝোপের মধ্যে সাপখোপ আছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, 'আমি একটা কাপড় ঝুলিয়ে দিচ্ছি, তুমি ধরে ধরে উঠে এসো।'

চিংকু ব্যাপারটা অনুমান করে বললে, 'জ্যাঠামশাই, সে আমি পারব না।'

ভদ্রলোক হঠাৎ খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'পারবে না তো ঢুকেছিলে

কেন ? ঢুকেছিলে কেন ? থাকো সারারাত ওইখানে।'

বৃদ্ধা বললেন, 'খোকা, তোর ওই এক দোষ, কাজের সময় মেজাজ খারাপ করে ফেলিস। এসব কাজ ঠান্ডা মাথায় করতে হয়।'

ভদ্রলোক বললেন, 'কাজটা আমি করব, না, ও করবে ? কাজটা কার ? কে ঢুকেছে ওখানে ?' চিঙ্কুকে বললেন, 'আর-একটা হতে পারে। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। মনে করো, তুমি একটা বালতি। দড়ি ছিঁড়ে পাতকোয় পড়ে গেছ। আমি তোমাকে টেনে তুলছি। তুমি কাপড়টা চেপে ধরো। আমি টেনে-টেনে তুলি। তোমার ওজন কত ?'

'তা তো জানি না জেঠু।'

'তুমি কী জানো বাপু ? লেখাপড়া কিছু করো ?'

বৃদ্ধা বললেন, 'এই দ্যাখো, তুমি আবার ভুল করলে। লেখাপড়ার, সঙ্গে নিজের ওজন জানার কী দরকার ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'বুঝলে মা, ওভাবেও হবে না। কেন বলো তো। ওই পাঁচিল। আমি ওই বিচ্ছুটাকে টেনে-হিঁচড়ে তুলতে পারব, কিন্তু দেওয়ালে ঘষড়ে গিয়ে ছালছামড়া উঠে যাবে। তা ছাড়া যা ক্যাবলাকান্ত, হঠাৎ 'আর পারছি না' বলে হাত ছেড়ে দিলেই হয়ে গেল।'

দুটো কথা চিঙ্কুর একেবারেই ভাল লাগল না, একটা হল বিচ্ছু আর-একটা হল ক্যাবলাকান্ত। কিছু করার নেই। হাতি পাঁকে পড়লে চামচিকিতেও লাথি মারে। ভদ্রলোকের হাতির মতো চেহারা হতে পারে, কিন্তু চামচিকি।

বৃদ্ধা বললেন, 'তা হলে ওকে উদ্ধার করার কী হবে ?'

'কী আবার হবে ? ও তো একটা বোকা ! পড়োনি, লুক বিফোর ইউ লিপ। লাফিয়ে পড়ার আগে দেখা উচিত ছিল, কোথায় লাফাচ্ছে ! ওখানেই থাক, যখন নিজে থেকে উদ্ধার হবে তখন হবে।'

'আরে, ও লাফিয়ে পড়বে কেন ? গেট দিয়ে ঢুকেছিল। ওকে বন্ধ করে রেখে চলে গেছে। ওর কী দোষ ?'

'ও ঢুকেছিল কেন ? আমি ঢুকতে বলেছিলুম। এখন দমকলে খবর দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

চিঙ্কু বললে, 'জেঠু, আপনি আমার বাড়িতে একটু খবর দিন না।'

বৃদ্ধা বললেন, 'সেই ভাল। যাদের ছেলে, তারাই এসে উদ্ধার করে

নিয়ে যাক।'

'যা বলবে।' ভদ্রলোক বারান্দা থেকে সরে গেলেন।

বৃদ্ধা বললেন, 'খিদে তো পেয়েছে। নাড়ু খাবি? দাঁড়া, ঠোঙায় মুড়ে ছুঁড়ে দি।'

চিঙ্কু আবার গেটের কাছে চলে এল। একটা ঠোঙায় ছ'টা বড়-বড় নারকেল নাড়ু। এইবার যা কিছু হবে গেটের কাছে। ছাগল হাড়িকাঠে যাওয়ার আগে বটপাতা চিবোয়। চিঙ্কু তার চেয়ে ভাল জিনিস চিবোচ্ছে, নারকেল নাড়ু।

আধঘণ্টার মধ্যেই গেটের বাইরে জমায়েত তৈরি হল। অনেকের গলা। সেই ভদ্রলোকর গলাও পাওয়া গেল। চিঙ্কুর কাকা গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'চিঙ্কো।'

চিঙ্কু জানে, কাকাবাবু যখন চিঙ্কো বলেন, তখন ভীষণ রেগে আছেন।

চিঙ্কু উত্তর দিল, 'এই যে।'

কাকাবাবু বললেন, 'তোমার আমি জ্যান্ত ছাল ছাড়াব। থানা, পুলিশ, হাসপাতাল কিছুই আর বাকি রইল না।'

প্রকাশবাবুর গলা, 'এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখ, মাথা ঠাণ্ডা। আগে কালপ্রিটকে বের করা হোক।'

কাকাবাবু বললেন, 'সিভিয়ার পানিশমেন্ট দরকার।'

প্রকাশবাবু বললেন, 'সবই করতে হবে প্ল্যান করে, ঠান্ডা মাথায়। সকলের সঙ্গে কনসাল্ট করে।'

চিঙ্কুর বন্ধুরাও বাইরে এসে গেছে। বিশুর গলা, 'ও এর ভেতর লুকিয়ে ছিল? তাই খুঁজে-খুঁজে হয়রান।'

কথাটা শুনে চিঙ্কুর খুব আনন্দ হল।

কেথা থেকে দারোয়ান এসে গেছে কে জানে! হড়াস করে খুলে গেল বিশাল গেট। বাইরে একদল মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন থমকে। ফটফটে আলো। চিঙ্কু যেন জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এখনই সবাই এগিয়ে এসে গলায় মালা পরিয়ে দেবেন।

সবার আগে বিশু তীরবেগে ছুটে এসে চিঙ্কুকে ছুঁয়ে চিৎকার করে উঠল, 'চোর, চোর।' বিশুর ধারণা, খেলা তখনও চলছে।

সবাই হাত ধরে বাড়ি নিয়ে যায়। প্রকাশবাবু এগিয়ে এসে ছেলের

কান ধরলেন। কান ধরে টানতে-টানতে নিয়ে চললেন বাড়ি। ভদ্রলোক হঠাৎ গেয়ে উঠলেন—

কান ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা
আমি যে পথ চিনি না।

কাকাবাবু বলতে লাগলেন, 'এইসব ছেলেকে চোরের দাওয়াই দেওয়া উচিত।'

দরোয়ান শুধু বললে, 'ইসকা অন্দর ক্যায়সে ঘুসা।'

ভদ্রলোক বললেন, 'স্যার, আজকে সামান্য একটু পালিশ লাগিয়ে রাখবেন, বেশ করে মাজবেন কাল। কাল ভাল তিথি আছে। আজকে বউনিটা দিয়ে রাখুন।'



কাঁটায় কাঁটায়

প্রায় তিন মাস হয়ে গেল আমার জ্যাঠামশাই মারা গেছেন। সেদিন অক্ষয়বাবু এসে জ্যাঠামশাইয়ের একটা ছবি বেশ বড় করে, সুন্দর ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিয়ে গেছেন। ছবিটা জ্যাঠাইমার ছবির পাশে ঝোলানো হয়েছে। জ্যাঠামশাইয়ের মুখে সেই সুন্দর হাসি, যে-হাসি হেসে তিনি আমাকে বলতেন, পিন্টুবাবু আজ অমন মুখ-ভার কেন? কেউ কিছু বলেছে! কিসের দুঃখ তোমার! গরম রসগোল্লা খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি! হয়েছে যখন এখুনি ব্যবস্থা হচ্ছে। গোটাকুড়ি টপাটপ গালে ফেলে দাও। মনে ফুর্তি দেহে বল।' জ্যাঠামশাই অমনি মণি, মণি বলে হাঁকডাক শুরু করতেন। সব কাজ ফেলে ছুটে আসত মণি। মণি খুব মজার ছেলে। সেই ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে কাজ করতে করতে বড় হয়েছে। এই পৃথিবীতে তার কেউ নেই। নেই বলেই যেন তার আনন্দ। কথায় কথায় বলে, 'কেউ নেই বলেই, আমার সবাই আছে।' মণি ডাক শুনে ছুটে এসে বলত, 'ফরমাইয়ে, বড়বাবু।'

জ্যাঠামশাই বলতেন, 'রসগুল্লা লে-আও, গরমাগরম। কড়াসে উতারকে।'

'কিতনা?'

'চালিশঠো।'

'যো হুকুম।'

মণি অমনি ছুটলো মোড়ের দোকানে। বিশাল দোকান। গোলগাল পরেশদা সেই দোকানে বসে আছেন, ছানার মতো গায়ের রঙ। জ্যাঠামশাই বলতেন, 'পরেশ ঈশ্বরের অংশ। অমৃত বিতরণের পুণ্য কাজ নিয়ে সে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে। এইটেই ওর শেষ জন্ম। ছানার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে।'

নির্জন এই দুপুরে জ্যাঠামশাইয়ের ছবির সামনে দাঁড়ালেই মনে হয়, আমিই কারণ। আমার জন্যেই মারা গেলেন আমার দেবতার মতো

জ্যাঠামশাই। বাবার বকুনি খেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে না গেলে আমার জ্যাঠামশাই অমন করে খুঁজতে বেরোতেন না হাসপাতালে হাসপাতালে। ভেবেছিলেন আমি হয়তো গাড়িচাপা পড়েছি। কল্পনার চোখে দেখতে পাই, অন্ধকার রাত। সারা শহরে পুটপুট আলো, ধুলো, ধোঁয়া। রাস্তায় এলোমেলো গাড়ি। গাড়ির পর গাড়ি। জ্যাঠামশাই মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে যেই রাস্তা পার হতে গেলেন একটা সাদা গাড়ি হুস করে এসে দেহটাকে পিষে দিয়ে চলে গেল। আমিই দায়ী। আমি, আমি, আমি। আমি একটা মহা শয়তান, গাধা। অলস, অকর্মণ্য। গবেট। আমার বাবা ঠিকই বলেছেন—একমাত্র ছেলে। ছেলেটাকে খরচের খাতায় লিখে রাখো। খাইয়ে দাইয়ে মোষের মতো একটা শরীর তৈরি করে দাও। ওই ঠেলা ঠেলে, মোট বয়ে দিন চালাবে। ওই হয়, ভদ্র, শিক্ষিতের ঘরের ছাগল জন্মায়। যাদের কোনও অভাব নেই, তাদের ঘরের ছেলেরাই হয় অমানুষ। ফুটপাতের ছেলেরা মানুষ হতে পারে, বড় হতে পারে সুযোগ পেলে। আদুরে ছেলেরা স্বার্থপর বাঁদরই হয়। না চাইতে সব পেয়ে যায় তো। ছেলেদের বেশ দুঃখকষ্টে রাখতে হয়, তবেই মানুষ হয়। জীবনটাকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে শেখে। স্বার্থপর জানোয়ার হয়ে যায় না। আমি দায়ী। আমি সব কারণের মূল কারণ। আমার জ্যাঠামশাই আরও কত বড় হতে পারতেন। বৃদ্ধ। একমাথা চুল ঘাড়ের কাছে লুটোপুটি করত। সাদা তুষারের মতো। আরামচেয়ারে আলোয়ান গায়ে বসে থাকতেন। আমি তখন অনেক বড়। জ্যাঠামশাই যেমন চেয়েছিলেন, আমি সেইরকমই হতুম। তিনবার বিলেত ফেরত। বিশাল বড় ডাক্তার। জ্যাঠামশাইয়ের পায়ের কাছে ছোট ছেলেটির মতো বসে লন্ডনের গল্প বলতুম। সব শেষ করে দিয়েছি আমি। সব স্বপ্ন চুরমার। আমি ঠিক করে ফেলেছি, নিজেকে মেরেই ফেলব। মরলে আমি আমার সবচেয়ে প্রাণের মানুষের দেখা পাব। ভগবান যখন স্বর্গের দরজা খুলে দেবেন তখন দেখব স্বর্গের বাগানে, গাছের তলায় আমার জ্যাঠামশাই বসে আছেন। ওই ছবির হাসি আরও উজ্জ্বল হয়েছে। স্বর্গে গেলে শুনেছি মানুষের গায়ের রঙ সোনার হয়ে যায়। চুলগুলো হয়ে যায় রুপোর মতো। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে রুবির মতো।

দুপুরবেলা সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। বাবা অফিসে। মা একটু

চোখে ঠেকাঠেকি হয়ে গেল। কি যেন একটা শক্তির তরঙ্গ ধীরে ধীরে আমার ভেতর চলে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সারা শরীর অসাড় হয়ে গেল। যখন আবার আমি আমাতে ফিরে এলুম তখন বৃষ্টি থেমে আকাশে ফ্যাকাশে মতো একটা চাঁদ বেরিয়েছে। আকাশের তলার দিকে দৈত্যের মতো একটা মেঘ ঝুলে আছে। ভিজে ভিজে বাতাস। গা শিরশির করছে।

সত্যদা আমাদের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। ফিরে যাবার সময় বললেন, 'পিন্টু আজ থেকে তুমি অন্য মানুষ হয়ে গেলে। তোমাতে আর আমাতে বয়েস ছাড়া কোনও পার্থক্য রইল না।'

বিশু বললে, 'ব্যাপারটা তুই বুঝতে পারলি ?'

'না রে ! কি একটা হলো ; কিন্তু কি হলো আমার কোনও ধারণা নেই। তবে ভীষণ হালকা লাগছে, শোলার মতো। মনে কোনও ভয় নেই, চিন্তা নেই। অদ্ভুত লাগছে। কি ব্যাপার বল তো !'

'একে কি বলে জানিস, আমি বদল। তোর আমিটাকে তুলে নিয়ে সত্যদার আমিটাকে বসিয়ে দিয়েছেন। সত্যদার ইচ্ছাই তোর ইচ্ছা বলে মনে হবে।'

'তার মানে আমি ক্রীতদাস হয়ে গেলুম।'

'না ক্রীতইচ্ছা, ক্রীতমন। ভয় পাচ্ছিস ? ভয় নেই। দেখ না, কি হয় ! আমার কি খারাপ হয়েছে !'

রাস্তার যেখানে যেখানে বৃষ্টির জল জমেছে, সেখানে সেখানে ছোট ছোট চাঁদের আলোর পুকুর তৈরি হয়েছে। যেন কেউ আয়না ভেঙে পথের ওপর ফেলে দিয়ে গেছে। গোঁসাইদের বাড়ির পাঁচিলে মাধবী-লতায় থোকা থোকা ফুল ফুটেছে। জল তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে হীরের নোলকের মতো।

বাবার শিয়রে মা বসে আছেন গালে হাত দিয়ে চুপ করে। আমি বাবার পায়ের দিকে বিছানার একপাশে বসলুম। মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। খুব মৃদু গলায় বললেন, 'এত রাত পর্যন্ত তুমি ছিলে কোথায় ? এখনও শোধরাতে পারলে না নিজেকে !'

আমি চুপ করে রইলুম। মনে মনে হাসলুম। শত্রুভাব এখনও গেল না।

মা বললেন, 'বঠঠাকুর ছিলেন, এ-সংসারের লক্ষ্মী। তিনিও গেলেন,

একে একে সব যেতে বসেছে। আমি এখন কি করি! আমার মাথার ওপর যে কেউ নেই!'

ফস্ করে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কেন, ভগবান আছেন।'

মা বললেন, 'আগে ছিলেন এখন আর নেই।'

'ও, তোমার অভিমানের কথা। বিপদেই ভগবান। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে।'

'শুনে শুনে মানুষের কান পচে গেছে। ও-সব আমাকে আর শোনাতে এস না।'

'আমার বিশ্বাস।'

ভগবানকে বিশ্বাস না করে নিজেকে বিশ্বাস করলে অনেক মঙ্গল হতো। সব কিছুর মূলে তুমি। তুমি যদি বাড়ি ছেড়ে না পালাতে… ।'

'তুমি আর পুরনো কাসুন্দি ঘেঁট না মা। যা হবার তা হয়ে গেছে। যা হচ্ছে, সেইটাকেই দু'জনে মিলে সামলাবার চেষ্টা করি এসো। তুমি তো বললে, নিজের ওপর বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসেই কাজ হোক। প্রথম কথা বাবার সেবা আর চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হবে! এইভাবে দু'জনে দু'মাথায় বসে কথা কাটাকাটি করলে তো কিছু হবে না। টাকা-পয়সা কোথায় কেমন কি আছে বলো, সেই মতো ব্যবস্থা হবে।'

'টাকা-পয়সা না থাকলে ব্যবস্থা হবে না?'

'তুমি কিন্তু আবার বাঁকা দিকে চলে যাচ্ছ?'

'আমি বলতে চাইছি ছেলে হয়ে তোমার কোনও কর্তব্য নেই?'

'নিশ্চয় আছে; কিন্তু আমি এখনও ছাত্র। আমার কোনও রোজগার নেই।'

'তুমি যখন বাড়ি থেকে পালাতে পেরেছিলে তখন তুমি রোজগারও নিশ্চয় করতে পারবে।'

'মা, আমি ইচ্ছে করে পালাইনি। আমি পালিয়েছিলুম, রাগে, দুঃখে, অপমানে। তোমরা আমাকে একদিনের জন্যেও ভালো কথা বলনি। উঠতে, বসতে, কেবল বকেছ, ধমকেছ। আমি সন্ন্যাসী হব বলে বেরিয়ে গিয়েছিলুম। এখন দেখছি ফিরে না এলেই ভালো হতো। তোমাদের ছেলে মানুষ করার কোনও যোগ্যতা নেই। তোমরা লোভী, তোমরা স্বার্থপর, তোমরা হিংসুক, তোমরা অন্যের ভালো সহ্য করতে পারো না। তোমরা প্রতি কথায় বিশুর উপমা দাও; কারণ বিশুর ভালো

তোমরা সহ্য করতে পারো না। তুমি বেশ ভালোই জানো, বাবা আর ভালো হয়ে উঠবেন না, তোমাকে আর আমাকেই লড়াই করতে হবে। তুমি কিন্তু আমাকে সহ্য করতে পারো না। কেন পারো না সে তুমিই জানো।'

মা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে শুরু করলেন। মায়ের কান্না দেখে আমার আনন্দই হলো। বহুদিন মা আমাকে কাঁদিয়ে এসেছেন। আজ মায়ের কান্নার দিন। মা যখন বাবাকে শান্ত করতে পারতেন, তখন উল্টোটাই করেছেন। কিছু হলো না, কিছু হলো না বলে বাবাকে উত্তেজিত করেছেন। আর কেবলই বলতেন, জ্যাঠামশাইয়ের আদরে আমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। বঠঠাকুর ছেলেটার মাথা খাচ্ছেন। এর ফলে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্কে একটা চিড় ধরছিল। মা আবার জ্যাঠাইমাকে সহ্য করতে পারতেন না। কারণ জ্যাঠাইমা ছিলেন মায়ের চেয়ে সুন্দরী ও শিক্ষিতা। এখন বুঝতে পারছি, কেন জ্যাঠামশাই আমাকে অমন উতলা হয়ে হাসপাতালে হাসপাতালে খুঁজতে ছুটেছিলেন। তিনি জানতেন আমাকে খুঁজে পাওয়া না গেলে সমস্ত দোষটা জ্যাঠামশাইয়ের ঘাড়ে এসে চাপত। এমনও হতে পারে, জ্যাঠামশাই গাড়ি চাপা পড়েননি, গাড়ির তলায় পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। আমার বাবা এই মাকে যে খুব একটা সহ্য করতে পারতেন, তা নয়। বেশিরভাগ সময় গম্ভীর হয়েই থাকতেন। তবু আমার মা আমার কর্তব্য মাকে সম্মান করা, ভক্তি করা।

তিন

বাবার সমস্ত কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে বেশ অবাক হয়ে গেলুম। বাবা বেশ বড়লোক। চারদিকে অনেক টাকা জমে আছে। ব্যাঙ্কে, পোস্টাপিসে। খুব দুঃখ হলো—কিছুই ভোগ করতে পারলেন না। সবই পড়ে থাকবে।

সত্যদা বললেন, 'তুমি কি ওই টাকা ভোগ করতে চাও? তাহলে তোমার জীবনটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি এই অনুপার্জিত টাকাটা ওড়াতে শিখবে। পাঁচটা বন্ধুবান্ধব এসে জুটবে। চরিত্রটা

খোয়াবে। জানো তো বাঙালীর ধর্ম হলো, এক পুরুষ সঞ্চয় করে, আর এক পুরুষ এসে উড়িয়ে দেয়, তার পরের পুরুষ ভিক্ষে করে।'

'সত্যদা, আমার সেরকম কোনও ইচ্ছে নেই। তাছাড়া ও টাকা আমার নয়। আমি ভিক্ষে করেই বড় হব। বড় হয়ে ভিক্ষে করতে চাই না। যা করব নিজের চেষ্টায় করব। অপরের সাহায্যের কোনও প্রয়োজন নেই।'

'গুড। তোমার এই আত্মবিশ্বাসটাই আমি চেয়েছিলুম। মনে করো তোমার কিছুই নেই। তোমার তুমি ছাড়া কেউ নেই। জানো তো, পাখিকে কেউ উড়তে শেখায় না, পাখি নিজেই উড়তে শেখে। তুমি ওই টাকায় বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা কবো, আর যা থাকবে, সেটা রেখে দাও তোমার মায়ের জন্যে। তাঁর সাবাজীবনের ব্যবস্থা।'

'বাবাকে কোনও নার্সিং হোমে রাখব কি?'

'কখনই না। দু'হাতে জানপ্রাণ দিয়ে পিতার সেবা করো। জানবে পিতা আর মাতার আশীর্বাদ ছাড়া কোনও মানুষ বড় হতে পারে না। যাও তোমার ওই সুখী সুখী আয়েসী ভাবটা ছেড়ে পিতার সেবায় লেগে পড়। পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, পিতা হি পরমন্তপ। কোনও নার্সও রাখবে না। সব নিজের হাতে করবে। দেখবে, শক্তি পাবে, অসীম শক্তি।'

'আমার লেখা-পড়া, আমার পরীক্ষার কি হবে!'

'তাও হবে। চব্বিশ ঘণ্টায় একটা দিন। সময়টা কিছু কম নয়, যদি ঠিকমতো হিসেব করে খরচ করতে শেখো। বাবার ঘরটাকেই লেখাপড়ার ঘর করে নাও। পড়বে আর সেবা করবে। মনে মনে বাবাকে বলবে—দেখুন আপনি যা ভালোবাসতেন, আমি তাই করছি। আপনার নীরব আশীর্বাদ যেন আমাকে ঘিরে থাকে।'

সন্ধ্যেবেলা, হঠাৎ তৃষা এসে হাজির। দরজার সামনে তৃষাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্যে আমি কিরকম হয়ে গেলুম। যেন একটা ছবি দেখছি। আবার ভয়! এখুনি মা হয়তো অপমান করে তাড়িয়ে দেবেন।

মা বললেন, 'কে তুমি?'

আমি কিছু বলার আগেই তৃষা বললে, 'আমি তৃষা। পিণ্টুদা আমার বন্ধু।'

মা আমার দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অদ্ভুত এক কথা বললেন, 'তুমি তো ভারি সুন্দর।'

তৃষা এগিয়ে এসে নিচু হয়ে মাকে প্রণাম করল। যখন মাথা তুলল, তৃষা কাঁদছে, 'এ কি হলো, কাকাবাবুর এ কি হলো!'

মা হঠাৎ তৃষাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। জড়িয়ে ধরে হুহু করে কাঁদতে লাগলেন। মা চেয়েছিলেন, আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে। পারছিলেন না; কারণ ঘৃণা। এখন সামনে তৃষাকে পেয়ে গেছেন। চাপা আবেগ উৎলে উঠেছে। তৃষা ঠিক সময়ে এসেছে। আশ্চর্য মেয়ে। কেউ তো আসেনি। ও কেন এল! দেবীর মতো কোনও মেয়ে পৃথিবীতে হঠাৎ এসে যায়। মা আঁচল দিয়ে তৃষার চোখ মুছিয়ে নিজের চোখ মুছলেন। ঘরে এত সুন্দর একটা নাটক হচ্ছে, বাবা তার কিছুই জানলেন না। টিপটিপ করে স্যালাইন আর গ্লুকোজ চলেছে। একটু পরেই ডাক্তারবাবু আসবেন।

তৃষা বলল, 'কাকিমা, আপনাদের বাড়িতে লোকজন কম। শুনেছি আপনার শরীর খারাপ, আমি আপনাদের সাহায্য করতেই এসেছি। মনে করুন, আমি আপনার মেয়ে। নাই বা হলুম পেটের মেয়ে।'

মা বললেন, 'তুমি কে মা? কোথায় তোমার বাড়ি?'

'আমার বাড়ি আপনি চিনতে পারবেন না মা। একসময় আমাদের বাড়ির খুব নামডাক ছিল। তখন সবাই চিনতো। এখন চেনা লোকও আমাদের চিনতে পারে না। কারণ আমাদের অবস্থা পড়ে গেছে। সংসারে আমাদের এক দাদা ছাড়া আর কেউ নেই। দু'জনে মিলে একটা তেলেভাজার দোকান চালাই।'

'তোমার আর কেউ নেই কেন মা?'

'আমরা সেবার হিমাচলে বেড়াতে গেলুম। বেঁচে ফিরে এলুম আমরা দু'জনে। বাবা আর মা পড়ে রইলেন খাদের ভেতরে। কারোর কারোর সঙ্গে ভগবান এইরকম ব্যবহারই করেন।'

'যেমন আমাদের সঙ্গে করছেন।'

তৃষা অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে রইল। রান্নাঘরে ঢুকে যা পারল সামান্য কিছু রেঁধে দিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল আমাকে, 'তুমি অন্যরকম ভেবো না। আমি আর দাদা এইরকমই

করি। দাদা বলে, এইটাই আমাদের ব্রত। মানুষের সেবা। কাল থেকে সারারাত আমি থাকব, যাতে তোমরা একটু ঘুমোতে পার। পিণ্টু একটু শক্ত হও।'

আমি অবাক হয়ে গেলুম। তৃষা আমাকে দাদা বলছে না। নাম ধরে ডাকছে। যেন আমার দিদি।

'তোমাকে আর দাদা বলব না। কেন জানো? তোমার আর আমার এক বয়েস। এক স্কুলে পড়লে এক ক্লাসেই পড়তুম। আমরা বন্ধু। শোনো তোমার অনেক আগেই একের পর এক বিপদ এসে আমাদের শক্ত করে দিয়ে গেছে। যা আসে তা আসে।'

'তৃষা, তুমি এত সুন্দর কথা কি করে বলছ?'

'শুনবে তাহলে, বিপদের পর বিপদ, অভাব, অপমান আমার বয়েস বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। তাছাড়া মেয়েরা একটু পাকাই হয়।'

তৃষাকে কিছুটা এগিয়ে দিতে গেলুম। যে রাস্তায় ওদের বাড়ি সেই রাস্তাটা খুব নির্জন। এ-পাড়ার ছেলেরা ক্রমশই বুড়োদের মতো হয়ে যাচ্ছে। মদ খায়, গাঁজা খায়, মেয়েদের সিটি মারে। হাত ধরে টানে। অনেক রকমের পাপ কাজ করে। কেউ কিছু বলার সাহস পায় না। দল বেঁধে এসে খুন করে যাবে। দেশের অবস্থা এইরকমই হয়েছে। কি করা যাবে!

কিছুদূর যাবার পরই দেখি ব্রিজের ওপর সত্যদা দাঁড়িয়ে আছেন। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। সত্যদা কি মনে করবেন! তৃষার মতো সুন্দরী মেয়ে আমার কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে হাঁটছে। রাতও হয়েছে বেশ। এখুনি বলবেন হয়তো—'বাঃ পিন্টু! তোমার আর লেখাপড়া হবে না। মেয়েদের সঙ্গে ঘুরতে শিখে গেছ!'

আমার হাঁটার বেগ কমে এসেছে। সত্যদা এগিয়ে এলেন। এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এত রাতে তৃষার সঙ্গে চললে কোথায়?'

'তৃষাকে আপনি চেনেন?'

'চিনব না! তৃষা তো আমার ছাত্রী। ভালই হয়েছে, তোমাদের জন্যেই বোধহয় আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। এই পথটা মোটেই সুবিধের নয়। চলো এগিয়ে দিয়ে আসি।'

তৃষা বললে, 'আমি কাকাবাবুকে দেখতে গিয়েছিলুম।'

'ভালোই করেছ। ওদের একটু দেখাশোনা করো। পিন্টুর মায়েরও তো শরীর ভাল নয়।'

'হ্যাঁ, সত্যদা, আমি সেই কারণেই আরো গিয়েছিলুম।'

গোটা পথের কোথাও আলো নেই। অন্ধকার যারা পছন্দ করে, ইট মেরে সব বাল্ব ভেঙে দিয়েছে। সত্যদা বললেন, 'পিন্টু তোমাকে একটু মার্শাল-আর্ট শিখিয়ে দেব। এ-যুগে বাঁচতে গেলে আত্মরক্ষার কায়দা শিখতে হবে।'

'সত্যদা, আপনি কি জানতেন আমরা আসব!'

'শোনো, আমি বিশুকে পড়াচ্ছিলুম, হঠাৎ মনে হলো, যাই একটু ঘুরে আসি। পথ আমাকে এই দিকেই টেনে নিয়ে এল। এখন তুমি যা ব্যাখ্যা করবে করো।'

কিছুদূরে অন্ধকারে গোটাকতক আগুনের ফুটকি বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে। সিগারেটের আগুন। আমার জীবনে এইরকম ,একটা ঘটনা আছে। হঠাৎ হায়নারা ছুটে এসে আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছিল। ব্লেড চালিয়েছিল গালে। সেই থেকেই সিগারেটের আগুন অন্ধকারে জ্বলতে নিবতে দেখলে আমার হাতের মুঠো শক্ত হয়। সত্যদা তৃষাকে আড়াল করলেন। জায়গাটা আমরা পেরিয়ে গেলুম। নাকে হুহু করে মদের গন্ধ ভেসে এল।

সত্যদা বললেন, 'কাকে দোষ দেব! এই অবস্থার জন্যে আমরাও কম দায়ী নই। দেশের একটা অংশ এগিয়ে যাচ্ছে যে গতিতে, আর একটা অংশ পিছিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই গতিতেই। দেশটা কাপড়ের টুকরোর মতো ছিঁড়ে ফালা হয়ে যেতে বসেছে।'

ফেরার পথে সত্যদা বললেন, 'তৃষাদের পাড়াটা ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ওকে কোথাও সরিয়ে দিতে হবে। আমার যে একটামাত্র ঘর। তোমাদের বাড়িতে ওকে রাখো না।'

'আমি কে সত্যদা। সবই মায়ের ইচ্ছা।'

'তোমার মাকে বুঝিয়ে বলো না।'

'আপনি বলুন না। তৃষার দাদা রাজি হবে তো!'

'ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করবো। তৃষার ওপর বহু শয়তানের নজর। ওর কিছু হয়ে গেলে সহ্য করতে পারবো না।'

রাত অনেক হয়ে গেল। সারা পাড়া ঘুমে কাদা। মা আর আমি

জেগে বসে আছি। বাইরে চিৎকার করছে একপাল কুকুর। দমকা বাতাসে জানালার পাল্লা দুলে উঠছে। মায়ের মাথাটা থেকে ঢুলে পড়েছে। পাশের ঘরের বিছানায় মশারি টাঙিয়ে এসে, মাকে বললুম, 'তুমি একটু শুয়ে নাও। আমি বাবার কাছে আছি।'

'শোব কি রে! শোয়া যায়, না শোয়া উচিত!'

'উচিত, অনুচিত জানি না, তুমি একটু শুয়ে নাও। তা না হলে তুমি নিজেই অসুখে পড়ে যাবে। এখন তুমিও যদি পড়ে যাও, তাহলে খুব খারাপ হবে।'

মা টলতে টলতে উঠে গেলেন। আমি বাবার মাথার কাছে বসলুম। টিক্‌টিক্ করে ঘড়ি চলছে। বাবার এতদিনের সঙ্গী সেই টেবিল-ক্লক, যার অ্যালার্মের শব্দে আমাদের সকলের ঘুম ভাঙতো। বাবা চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। শরীর চাদরে ঢাকা, নিথর, নিস্পন্দ। ডাক্তার বলে গেছেন, একে বলে কোমা। জীবন আছে; কিন্তু চেতনা নেই। মাথার যে-অংশে চেতনা থাকে, সেই অংশটা বিকল হয়ে গেছে। আমি বাবার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকলুম, 'বাবা, আমি পিন্টু।' কতবার বললুম। মনে মনে আশা, হঠাৎ যদি ভগবান বাবাকে সুস্থ করে দেন। আমার ডাকে বিছানায় যদি উঠে বসেন, আমি অমনি পায়ে মাথা রেখে ক্ষমা চাইবো। আমার পালিয়ে যাওয়ার অপরাধের যে ক্ষমা চাওয়া হয়নি।

চার

বাবা, তাঁর ডায়েরিতে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন—'জানবে মানুষের একটি মাত্র ছেলে হওয়া মহাপাপ। ইংরেজিতে বলে, ওয়ান চাইল্ড সিন। সেই পাপের ফলভোগী আমি। খুব একটা উদাসীন হতে পারি না, এটাও আমার চরিত্রের এক মহা দোষ। নিজেকে নিয়েই বেশ মজায় থাকার অভ্যাস আমার নেই। আমার সমস্ত সুখ, সকল আনন্দ লুকিয়ে আছে তোমার ভেতরে। যেখানে যা কিছু ভালো দেখি, সুন্দর দেখি, গৌরবের দেখি, মহৎ দেখি, সবই মনে করি তোমাতে ফুটে উঠুক। আকাশে যত তারা, সবই যেন তোমার আকাশে গুণ

হয়ে ফুটে ওঠে। নিজের কোনও উচ্চাশা নেই, সমস্ত আশার প্রতিমূর্তি তুমি। তুমি বড় হবে। বড়, আরও বড়। গাছের মধ্যে যেমন গর্জন, মানুষের মধ্যে সেইরকম তুমি। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে, চারিত্রিক গুণে, শিক্ষায়, সেবায়। নৃপতির মতো হয়ে উঠবে তুমি। অচল, অটল, ধার্মিক। বাল্য থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, যেন জাহাজের গতি। খাড়ি থেকে নদী, নদী থেকে অনন্ত সমুদ্রে। প্রথম দিকটায় একজন পাইলটের প্রয়োজন হয় জাহাজকে সমুদ্রে তুলে দেবার জন্যে, যাতে চড়ায় না আটকে যায়। পিতা সেই পাইলট। মানব-পোতকে জীবন-সমুদ্রে মুক্তি দেয়। সমুদ্রে কাপ্তেনের নিজের কেরামতি। নিজের শিক্ষা, নিজের চরিত্র। সেখানে প্রয়োজন সাহস, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি, দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, বিচার। আমার চরিত্রের দোষ—আমি বড় আবেগপ্রবণ। আমার রাগের চেয়ে অভিমানই বেশি। নিজের অক্ষমতার ওপর অভিমান। সবাই বলে, বাপকা বেটা। কোথায় সেই ছেলে, যে বাবার সমস্ত গুণের অধিকারী হয়ে বাবাকেও অতিক্রম করে যাবে। পিতার সমস্ত অহঙ্কার তার পুত্র। সেই অহঙ্কার আমি তৈরি করতে পারিনি, সে আমারই অক্ষমতা। সেই গ্লানি আমার কাছে অসহনীয়। সবাই বলেন, ভেবো না, ভেবো না, যা হবার তা হবে। আমার পুরুষকারে লাগে। আমি বিশ্বাস করি, চেষ্টায় কি না হয়! একশো ভাগ না হোক, চল্লিশ ভাগ হবে। জীবনকে ছেলেবেলা থেকেই বাঁধতে হয়। বাঁধন দিতে হয়। একবার আমি শিমুলতলায় বেড়াতে যাচ্ছিলুম। কারমাটার স্টেশনে দেখি এক দেহাতী মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। পরনে খাটো কাপড়, নীল জামা। তার বগলে শতরঞ্জিমোড়া বিছানার একটা বাণ্ডিল। দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সেই পোঁটলা আর লাঠিটি সন্তর্পণে বগলদাবা করে মানুষটি সাবধান হেঁটে চলেছে। এই দৃশ্যটি আমি ট্রেনের জানালায় বসে দেখেছিলুম। হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল, এই তো উপমা। জীবনকে এইরকম বেঁধেছেঁদে, আঁকড়ে ধরে এগোতে হয়। আলগা দিলেই চলে যায় নিজের আয়ত্তের বাইরে। ওই শতরঞ্জিটা হলো আদর্শ। প্রথমে আদর্শের মোড়কে জড়াতে হবে। এরপর দড়ির বাঁধন-সংযম, সৎসঙ্গ, সৎচিন্তা, সদ্ভাবনা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সাধনা প্রভৃতি দিয়ে কষে বাঁধতে হবে। আর ওই লাঠিটা হলো শিক্ষা। এই চিত্রটি চোখের

সামনে ধরে রাখতে পারলে সকলেরই উপকার। মানুষ পৃথিবীতে আসে বিকাশের জন্যে। নষ্ট হবার জন্যে নয়। মাটিতে বীজ ফেললে চারা হয়, সামান্য পরিচর্যায় গাছ হয়, ক্রমশ বড় হতে থাকে, ফুল হয়, ফল হয়। কোনও গাছ ইচ্ছে করে নিজেকে নষ্ট করে না। তার স্বাভাবিক প্রবণতাই হলো, ফল-ফুলে নিজেকে ভরিয়ে তোলা। মানুষ কিন্তু নিজেকে নষ্ট করে। নিজেকে মেরে ফেলে। বড় হবার বিশাল সম্ভাবনা নিজের আলস্যে হারিয়ে বসে। মানুষ দেহের ব্যায়াম করে। ভালো শরীর হয়। মনের ব্যায়ামই আসল ব্যায়াম। মনের জোরেই মানুষ এগোয়। সেই মনকে একাগ্র করো। ভীষণ একটা জেদ আনো। এই কথাগুলোই তোমাকে আমার বলার ছিল। সামনা-সামনি বলতে চাই। বলতে পারি না। অভিমানে আমার কথা আটকে যায়। আমার মুখ কঠিন কঠোর দেখায়। তখন কিন্তু আমি কাঁদি। ভেতরে ভেতরে কাঁদি। বাবা হওয়া বড় কষ্টের। ভীষণ এক দায়িত্ব। পুত্রই তো মানুষের পিতা। দূর থেকে তোমাকে যখন দেখি তখন মনে হয় নিজেকেই যেন দেখছি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, মৃত্যু আমার দরজায় এসে কড়া নাড়ছে। না-বলা কথা লেখা রইল তোমারই জন্যে। তোমার মঙ্গল কামনায়।'

বাবা রইলেন না। গভীর রাতে নিঃশব্দে চলে গেলেন অমর্ত্য-লোকে। মাথার কাছে বসেছিলেন মা। মায়ের পাশে তৃষা। পায়ের কাছে আমি, প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি।

বাবার পায়ে হাত বোলাতে গিয়ে দেখি, বরফের মতো ঠাণ্ডা। চোখ দুটো কাচের মতো স্থির। কবজির কাছে নাড়িতে আঙুল টিপে দেখি জীবন-ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। প্রবল শব্দে টেবিল-ঘড়িটা চলছে। মুখ তুলে তাকালুম। মায়ের মুখ। লাল পাড় শাড়ি। সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর। সব সাদা হয়ে যাবে একটু পরেই। পৃথিবীর কোনও কিছুই পাল্টাবে না। যা ছিল, যেমন ছিল, সব ঠিক সেইরকমই থাকবে। সকাল হলেই পুব আকাশে সূর্য উঠে পুবের জানালা দিয়ে যেমন আলোর ধারা ফেলে, ঠিক সেইরকমই ফেলবে। জানালার ওপারে কৃষ্ণচূড়া গাছের ঝিরিঝিরি পাতায় আলো নাচবে। রোজ যেমন নাচে।

কারোকে কিছু না বলে আমি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

চোখের সামনে মাঝরাতের তারা ছড়ানো আকাশ। বড় নিজের মনে হলো। পৃথিবীর মানুষের চিরসঙ্গী। অনুমান করার চেষ্টা করলুম, কতক্ষণ আগে বাবা ওই পথে চলে গেছেন! তাঁর রথ কি এখনও দেখা যাচ্ছে! শেষ স্বর্ণ নিশান। একটু ধোঁয়ার রেখা! তৃষা বুঝতে পেরেছিল। আমার পাশে এসে দাঁড়াল। হাতে হাত রেখে বললে,

'চলে গেলেন?'

এতক্ষণ আমার কিছু হয়নি। তৃষার কথায় আমার বুক ফেটে গেল। ভীষণ জোরে, বড় বড় ফোঁটায় যেন বৃষ্টি এল। আর ঠিক সেইসময় ঘরের ভেতর থেকে মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোরা এত রাতে দু'জন বাইরে গিয়ে দাঁড়ালি কেন? বাতাস লাগবে।'

আমি কোনও রকমে বললুম, 'তৃষা মাকে সামলাও।'

অন্ধকার পথ ধরে কেউ আসছেন। অন্য সময় হলে ভূতের ভয়ে দৌড় লাগাতুম। তখন আমার কোনও ভয় ছিল না। এমনও মনে হচ্ছিল, আমিও যদি যেতে পারি, যেভাবে বাবার হাত ধরে বেড়াতে যেতুম গড়ের মাঠে! সত্যদার গম্ভীর গলা—'কে পিন্টু নাকি?'

আমি হতবাক। গলার কাছে যে-কান্নাটা ঠেলে উঠেছিল নেমে গেল। এত রাতে সত্যদা!

'সত্যদা আপনি?

'কি হলো জানো, বসে বসে বেশ অঙ্ক কষছিলুম, হঠাৎ খাতার পাতায় বড় বড় দু'ফোঁটা জল পড়ল। তা মনে হলো, যাই পিন্টুর একটু খোঁজখবর নিয়ে আসি। কিছুটা পথ এসেছি, মাথায় ঝাপটা মেরে উড়ে গেল সাদা মতো একটা পাখি। প্যাঁচা-ট্যাঁচা হবে। শোনো রাতটা কেটে যেতে দাও। আমাদের যাত্রা হবে ভোরে.'

সত্যদা ঘরে ঢুকে বললেন, 'মা এইবার আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমি এসে গেছি তো!'

মা তখনও জানেন না, বাবা চলে গেছেন। মাকে নিয়ে তৃষা চলে গেল পাশের ঘরে। সেই রাতে দেখেছিলুম, মানুষ কত শক্ত হতে পারে প্রয়োজনে। সত্যদা পরে আমাকে বলেছিলেন, যে ঈশ্বর দুঃখ দেন, যন্ত্রণা দেন, তিনিই দেন সহ্যশক্তি। যেমন, জল পায় না বলে, মরুভূমিতে গাছ হয়ে যায় কাঁটা কাঁটা, মনসা গাছ।

বাড়িটা খালি হয়ে গেল। খালি হয়ে গেলেন আমার মা। মানুষ

চলে গেলে অন্য মানুষ ঠিকই থেকে যায়। দিন কতক তারা উদাস হয়ে থাকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। জীবনের সুর-ছন্দ কেটে যায়। তারপর জীবন এসে হাত ধরে নাচাতে নাচাতে আবার তালে বসিয়ে দেয়। একে একে সবই ফিরে আসে। ফিরে আসে হাসি। যেমন দুটো ফুসফুসের একটা কেটে বাদ দিলেও মানুষ বেঁচে থাকে। এমনকি সিগারেটও খেতে পারে। একটা শূন্যতা চাপা পড়ে থাকে ঘটনার পর ঘটনায়। ফোকলা দাঁতে জিভ চলে যাবার মতো, মন চলে যেতে পারে সেখানে, আবার ফিরে আসতে বাধ্য হয়। বেঁচে থাকাটা বড় দগদগে, রগরগে।

তৃষা আমাদের বাড়িতেই থেকে গেছে। মা তাকে ছাড়তে চাইলেন না। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, গত জন্মে এ আমার মেয়ে ছিল। সত্যদা তৃষার দাদাকে বললেন, 'শোনো বিকাশ, তৃষা বড় হচ্ছে। তার ওপর সুন্দরী। দিনকাল খুব খারাপ। ওকে আর দোকানে এনো না। তুমি একটা ছেলেটেলে রাখো। তোমার দোকান এখন বেশ জমে গেছে। ও একটা ভালো আশ্রয়ে থাক। ওকে আমি লেখা-পড়া শেখাই ভালো করে।'

তৃষা স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সত্যদা বলেছেন, তৃষাকে তুমিও পড়াবে। পড়ালে নিজের শিক্ষা ভালো হয়। তৃষাকে আমি পড়াই। পড়াতে বসলেই অনুভব করি, আমার ভেতরে আমার বাবা জেগে উঠছেন। তিনি দুর্দান্ত শিক্ষক ছিলেন। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই, যে-সব অঙ্ক আগে বুঝতেই পারতুম না, সেইসব অঙ্ক চটচট কষে ফেলছি। তৃষার কাছে আমি হারব না।

সত্যদা বিদেশী বইয়ের ব্যবসা করতেন। ঘর ঠাসা বই। কাঁধের ঝোলা ব্যাগে বই পুরে রোজ বারোটা, একটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তেন। অফিসে অফিসে বাঁধা খদ্দের। সত্যদাকে সবাই ভীষণ ভালোবাসতেন। সত্যদা বলে বলে বই দিতেন—এই বইটা আপনার পড়া উচিত। এই বইতে এই এই আছে। বইয়ের খবর সত্যদার মতো কেউ রাখতেন না। প্রকৃতই একজন জ্ঞানী মানুষ। সত্যদাকে সবাই শ্রদ্ধা করতেন সেই কারণে।

মাঝে মাঝে আমিও সত্যদার সঙ্গে বেরোতে শুরু করলুম। আমার কাঁধেও একটা ছোট ঝোলা, কিছু বই। বইয়ের ওজন কম নয়। এই

ভার বয়ে বয়ে সত্যদার এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, তাঁর কিছু মনেই হয় না। সত্যদা বলতেন, 'আমরাও এক ধরনের গাধা। ধোপার গাধা নই, মা সরস্বতীর গাধা। জ্ঞানের ভার বয়ে বেড়াচ্ছি।' সারাটা পথ আমরা নানারকম আলোচনা করতে করতে ঘুরে বেড়াতুম। কখনও মহাকাশে রকেট কোন বিজ্ঞানে ওড়ে, কখনও বিশ্বসাহিত্যের সেরা লেখক, কখনও দেশ-বিদেশের মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রা প্রণালী। বাসে-ট্রামে মানুষ খ্যাঁচোর-ম্যাঁচোর ঝগড়া করছে তার মধ্যে আমাদের আলোচনা চলছে—লিউইস ক্যারল কত বড় গণিতজ্ঞ ছিলেন। মাঝে মধ্যে বাসে-ট্রামেও জ্ঞানী মানুষ পাওয়া যেত। তাঁরাও আমাদের আলোচনায় যোগ দিতেন। বাসের কণ্ডাক্টাররা সত্যদাকে শ্রদ্ধা করতেন। বলতেন, আপনি উঠলে বাসের আবহাওয়াই পাল্টে যায়। বেশ কিছু কণ্ডাক্টার সত্যদার ছাত্র হয়েছিলেন। সপ্তাহে একদিন সত্যদার কাছে এসে তাঁরা নির্দেশ নিয়ে যেতেন। বাসে এঁদের কারোর সঙ্গে দেখা হলেই বাসটা স্কুল হয়ে যেত। সে বেশ মজা। কণ্ডাক্টার একদিকে টিকিট কাটছেন, আর একদিকে সত্যদার পড়ার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। বাসের সমস্ত ঝগড়াঝাঁটি মারামারি কিছুক্ষণের মতো বন্ধ হয়ে যেত। আমাদের স্টপেজ এলে সকলেই সশ্রদ্ধায় বলত—'নামতে দিন। নামতে দিন।' পেছন ফিরে হঠাৎ তাকিয়ে দেখেছি—অনেকেই সত্যদাকে হাত জোড় করে নমস্কার করছেন।

সত্যদার সঙ্গে ওইভাবে ঘুরতে ভীষণ ভালো লাগত। কত জ্ঞানী-গুণী মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হতো। হাইকোর্টের জজসাহেব। কোম্পানির ডিরেক্টার। বড় শিল্পী। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। পত্রিকার সম্পাদক। কেউ ভীষণ গম্ভীর, কেউ হাসিখুশি, রসিক, আমুদে। সত্যদা বলতেন, 'সব শিখে নাও পিন্টু। আমার পরে তুমি। পড়াকে পড়া হবে, ব্যবসাকে ব্যবসা। কারোর দাসত্ব করতে হবে না। অসীম জ্ঞানভাণ্ডারের মালিক হয়ে বসবে তুমি। তোমাকে আমি সেইভাবেই তৈরি করে দিয়ে যাবে।'

অনেক ঘোরাঘুরির পর খিদে পেলে, আমরা দু'জনে কোনও পার্কের গাছতলায় বসে ছোলাভাজা চিবোতুম। মাথার ওপর মেঘভাসা নীল আকাশ। চারপাশ জ্বলজ্বলে সবুজ সত্যদা জিজ্ঞেস করতেন,

'পৃথিবীটা কেমন লাগছে তোমার পিন্টু?'

'ভালোই, তবে যে-যার-সে-তার। মানুষ বড় একা।'

'তা যা বলেছ! দুটো পৃথিবী পাশাপাশাশি ঘুরছে। একটা ব্যবসার পৃথিবী, একটা ভালোবাসার পৃথিবী। ভালোবাসতে না পারলেই বড় একা। স্বার্থের কুকুর পেছন পেছন তাড়া করবে। তুমি অবশ্য ভালোবাসা পেয়ে গেছ। একজনকে ঠিক মতো ভালোবাসতে পারলে সকলকেই ভালোবাসা যায়। ভালোবাসার একটা নাড়ী থাকে মানুষের ভেতর। সেইটাকে একবার চালু করে দিতে পারলেই, মার দিয়া কেল্লা। ভালোবাসা পেলে ভালোবাসা আসে, যেমন বীজ ফেললে গাছ হয়, সার আর জল দিলে ফুল আসে গাছে। তৃষা মেয়েটাকে তোমার কেমন লাগে?'

সত্যদা আমার গুরুজন। এ প্রশ্নের আমি কি উত্তর দোব! কেমন করে বলব আমার পইতের আংটিটা তৃষার আঙুলে, তৃষার আংটি আমার আঙুলে। কেমন করে বলি, তৃষার কোলে মাথা রেখে বাবার অসুখের সময় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। এই সব কথা তো সত্যদাকে বলা যায় না। আমি মাথা নিচু করে বসে রইলুম।

সত্যদা বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। জানো তো, তোমার মতো বয়সে আমিও একটা মেয়েকে ভালোবাসতুম, স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়। বড় লোকের মেয়েকে ভালোবাসতে নেই। তারা ভালো-বাসা বোঝে না, বোঝে ভালো থাকা। চলে গেল আমেরিকা, আর ফিরলই না। আমারও আর বিয়ে করা হলো না। তা বেশ ভালোই আছি। সংসার মানেই শত ঝামেলা। তৃষা মেয়েটা খুব ভালো। ভীষণ ভালো। তোমার জীবনটা সুখের হবে। প্রথম দিকে দুঃখ পেলে, শেষের দিকে সুখ হয়। এই বইয়ের ব্যবসাটা তোমাকে দিয়ে যাব। তুমি পড়বে আর বিক্রি করবে। তৃষাকে আমি তৈরি করে দিয়ে যাব। তোমার উপযুক্ত করে।

তৃষা আর মা একঘরে একই বিছানায় শোন। আমি বাবার ঘরটাই বেছে নিয়েছি। যত রাত বাড়ে ততই মনে হয় একটা কিছু জমছে। ঘরটা ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছে। বাবার খাট, বাবার লেখা-পড়ার টেবিল যেন জীবন্ত। তিনি এসে বসছেন। বইয়ের যে জায়গাটা পড়ছিলেন, সেই জায়গাটা খুলেছেন। চশমার খাপ থেকে চশমা বের করছেন। আমি সব সাজিয়ে রাখি। বিছানার চাদর টানটান করে পাতি। বালিশের ওপর

বালিশ সাজাই। মশারি ফেলে গুঁজে রাখি। তারপর নিজে পড়তে বসে যাই। কোনও কিছু আটকে গেলে টেবিলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি। দু'তিনবার জিজ্ঞেস করার পরই আমার ভেতর থেকেই একটা উত্তর, একটা সমাধান বেরিয়ে আসে। আমি নিজেই তখন অবাক হয়ে যাই। আত্মা তাহলে আছে। মৃত্যুতেই মানুষের সব কিছু শেষ হয়ে যায় না! মাঝ রাত পেরিয়ে গেলে তৃষা একসময় উঠে আসে পাশের ঘর থেকে। পেছন দিক থেকে ঝুঁকে পড়ে আমার কাঁধের ওপর দিয়ে। তৃষা একটু লম্বা হয়েছে। আরও ফর্সা হয়েছে। কানের কাছে পাতলা ঠোঁট দুটো রেখে ফিসফিস করে বলবে 'মহাশয়, এইবার কিঞ্চিৎ নিদ্রা যাও। রাতের অপমান করিও না। প্রত্যূষে আবার হইবে।' তৃষার রেশমের মতো চুল এরই মধ্যে কোমর ছাপিয়ে নেমে গেছে। সেই চুল ঝুলে পড়ত আমার বুকের ওপর। তখন আমার মনে হতো, রাত কত সুন্দর! একটা ছেলে, একটা মেয়ে, নিকষ কালো রাত, তারার চুমকি, মধুর মতো মিষ্টি বাতাস। আমি বাবার বিছানার দিকে তাকিয়ে বলতুম, মৃত্যু আছে, দুঃখ আছে, বিরহের দহন আছে, তবু জীবন কত সুন্দর। পৃথিবীতে নিজের জন্যে বেঁচে থাকায় কোনও সুখ নেই। অন্যের জন্যে বাঁচতে হয়। বাবা চেয়েছিলেন আমার জন্যে বাঁচতে। ছেলেকে মানুষ করবো। আমি বাঁচবো তৃষার জন্যে। তৃষাকে সুখী করবো। তৃষা হলো সুন্দর একটা ফুল।

আমার মাধ্যমিক পরীক্ষা এসে গেল। বিশু বললে, 'এইবার ঝিঁঝি মারতে হবে পিন্টু। আর কোনও কথা নয়।' সন্ধ্যেবেলা বিশু চলে আসত আমাদের বাড়িতে। বাবার ঘরের মেঝেতে মোটা শতরঞ্জি। শুরু হতো আমাদের পড়া। বিশু মাঝে মাঝে বলত, 'তুই আমাকে পড়া।'

তৃষা আমাদের জোগানদার—কখনও মুড়ি চানাচুর, কখনও একটা লজেন্স, কখনও গরম তেলেভাজা। বিশু বলত, 'তোদের বাড়িতে এলে মনে হয় স্বর্গে এসেছি।' বিশু আর রাতে বাড়ি ফিরত না। সারা রাতই চলত আমাদের সাধনা। মাঝে মাঝে সত্যদা আসতেন। তখন আরও জমে যেত আমাদের পড়া। একটা সময় মনে হতো, লেখা-পড়ার মতো জিনিস নেই। সত্যদা বলতেন, পৃথিবীতে ছাত্র হয়ে থাকাটাই আনন্দের। যতদিন ছাত্র থাকতে পারো, ততদিনই ভালো। খালি শিখে যাও। জ্ঞানের নেশায় আটকে থাকো।

'পরীক্ষার ফল বেরোতে দেরি আছে। আমি এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসলুম। সেই ঘটনাটা ঘটে গেল মাঝরাতে। তৃষা পড়তে বসেছিল আমার কাছে। অনেকক্ষণ লেখা-পড়ার পর শতরঞ্জির একপাশে তৃষা ঘুমিয়ে পড়েছে। শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। ছড়ানো চুলের ওপর ভাসছে তার পানপাতার মতো মুখ। কপালের মাঝখানে ছোট্ট একটা টিপ। মোমের মতো দুটো পা। মা আজকাল আর বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারেন না। পাশের ঘরে মা ঘুমিয়ে আছেন। আজকাল ঘুমের মধ্যেই মা কথা বলেন। বোঝার চেষ্টা করলেই বেঝো যায়। বাবার সঙ্গে কথা বলেন। বাবা ডাকছেন, মা উত্তর দিচ্ছেন। বাবা যেন কিছু খেতে চাইছেন না, মা অনুরোধ করছেন খেয়ে নেবার জন্যে। বাবা তেলেভাজা খেতে ভীষণ ভালোবাসতেন, তৃষার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মাথায় একটা গল্প এসে গেল। একটা মেয়ে আর দুটো ছেলের গল্প। তিনজনেই কিশোর। তিনজনেই বড় হয়ে উঠছে। কিশোরীর চোখের সামনে দুই কিশোর যেন রেসের ঘোড়া। দুজনেই প্রাণপণ ছুটছে। কে হারে, কে জেতে! দৌড়ের পাল্লা নেহাত কম নয়। পাকের পর পাক মারছে। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। পায়ের ক্ষুরে ক্ষুরে ধুলো উড়ছে। পায়ের নালের সঙ্গে পাথরের ঘষায় চকমকি পাথরের মতো আগুনের ফিনকি। সুন্দরী কিশোরী একটি সোঁদাল গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে আছে। ফুরফুর করে ঝরে পড়ছে হলুদ ফুল। কিশোরীর পরনে চাঁপা ফুলের পোশাক। গলায় একটা মুক্তোর মালা। যে-ঘোড়া জিতবে তার গলায় ঝুলিয়ে দেবে মুক্তোর মালা। ঘোড়া দুটো ছুটছে। একটা ঘোড়ার নাম পিন্টু, আর একটা ঘোড়ার নাম বিশু।

গল্পটা বেশ গুছিয়ে লিখে ফেললুম। ভোরের কাছাকাছি সময়ে গল্পটা শেষ হয়ে গেল। মনে হলো অলৌকিক এক অনুভূতি। কি যেন একটা ঘটে গেল! জীবনের প্রথম অন্যায় কাজটা বোধ হয় করা হলো সেই ভোরে। আকাশে পেঁয়াজের খোলার আলো। বাতাস হিম হিম! তৃষা চিৎ হয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাতলা ঠোঁট দুটো অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে। আমি মনে মনে সংকল্প করে নিলুম, পিন্টু-ঘোড়া জিতবেই। বিশু-ঘোড়া হারবে। তারপর ধীরে ধীরে আমার ঠোঁট নেমে এল। আলতো করে ছুঁয়ে গেল তৃষার ঠোঁট। আমার শ্বাস-প্রশ্বাস ভীষণ দ্রুত হলো। বুকের কাছটা ছলকে উঠল। ভয় আনন্দ, নতুন এক

অভিজ্ঞতা। তৃষা একবার একটু চোখ খুলল। ঠোঁটের কোণে খেলে গেল মুচকি হাসি। দু'হাত তুলে আমাকে ধরার চেষ্টা করল। সেই মুহূর্তেই মনে হলো, মা উঠে পড়েছেন। চারপাশে যত পাখি ছিল সব একসঙ্গে চিৎকার শুরু করেছে—ওরে, ভোর হয়েছে। ভোর হয়েছে। রাস্তার কলে বালতি ফেলার শব্দ।

ওইদিনই সত্যদা আমাকে বললেন, 'পিন্টু আজ তুমি একদিকে যাও, আমি একদিকে। অনেক নতুন বই তুলেছি। ভাগাভাগি করে সকলকেই দেখাতে হবে। এইবার তোমার একটু একা একাই ঘোরা উচিত। আত্মবিশ্বাস বাড়বে।'

সত্যদা আমাকে দিলেন, সাহিত্যের এলাকা। পত্র-পত্রিকার অফিসে সম্পাদক মহাশয়দের বই দেখাতে হবে। সকলের কাছেই আমি সত্যদার সঙ্গে আগে আগে গেছি। কেউ খুব অল্প কথার মানুষ, কেউ আবার ভীষণ বেশি কথা বলেন, হা হা করে হাসেন। ঘন ঘন সিগারেট খান। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে স্বদেশ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে। তাঁর নাম সুদর্শন বন্দ্যোপাধ্যায়। গোলগাল, সুন্দর চেহারা। মধ্যবয়সী। আমাকে দেখলেই বলতেন—এই ছেলেটার দিকে নজর রাখা উচিত। দেখতে হবে, এ কি করে! আমাদের সাবজেক্ট। বলেই তিনি আমাকে বিশ্লেষণ করতেন—চোখ দুটো বড় বড়। জল টল-টলে, কিন্তু আগুন আছে। চেহারাটা নরম : কিন্তু ধার আছে। হাঁসলে মনে হয় কাঁদছে। সামনে বসে আছে, কিন্তু মনে হয় বহু দূরে। এ যেন সেই বাউলের গানের উপমা—ঘরের ভেতর চোর কুঠরি। সেই স্বদেশ পত্রিকার সুদর্শনবাবুর কাছেই আগে গেলুম। তিনি বেশ ভালো মেজাজেই ছিলেন। মুখে সবে একটা পান পুরেছেন। সেই ভরাট মুখেই জিভ ওল্টানো অবস্থাতেই বললেন, 'আরে, এসো এসো, জ্ঞানদাস এসো।' সুদর্শনবাবু মাঝে মধ্যে আমাকে জ্ঞানদাস বলেন। আমার ঝোলায় নাকি জ্ঞান ভরা থাকে। আমাকে বসতে না বললে আমি বসি না। গুরুজনকে এই সম্মানটুকু দেখাতে হয়। সুদর্শনবাবু বললেন, 'বসো, বসো। চেয়ার টেনে বসো।'

আমি বসলুম। তিনি ঢোক গিলে মুখ খালি করে বললেন, 'আজ অনেক খাদ্য এনেছ মনে হনে হচ্ছে। দেখাও দেখাও।'

পরপর সমস্ত বই বের করে তাঁর সামনে সাজিয়ে দিলুম। মুগ্ধ

দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আরে বাপরে, আজ কি করেছ ?'

একে একে বই দেখলেন। যা নেওয়ার বেছে নিলেন। বাকি বই সব ভরে ফেললুম আমার ঝোলায়। এইবার আমি উঠব।

সুদর্শনবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে বেশ একটু উত্তেজিত মনে হচ্ছে! কি ব্যাপার ?'

ভয়ে ভয়ে বললুম, 'আমার একটা নিবেদন ছিল!

'নৈবেদ্যটা কি ?'

ইতস্তত করে বললুম, 'একটা গল্প এনেছিলুম।'

'মরেচে, তুমিও লেখক হয়ে গেলে! দেশে আর পাঠক থাকবে না দেখছি! সবাই লেখক।'

আমি লজ্জায় উঠে দাঁড়ালুম। সত্যিই তো, আমি লেখার কি জানি! তাছাড়া স্বদেশ একটা বড় কাগজ। সেরা কাগজ। সেখানে আমার মতো অবোধ লেখক লেখা আনে কোন সাহসে! নমস্কার করে বললুম, 'আমি তাহলে আসি।'

'কি হলো ? তোমার গল্প ?'

'আমি বোকার মতো বলে ফেলেছিলুম।'

'তাহলে এখন চালাক হয়ে দিয়ে দাও। কে বলতে পারে, তোমার হাত দিয়ে ভালো জিনিস বেরোবে না! দাও, দাও।'

কাঁপা কাঁপা হাতে লেখাটা বের করে তাঁর হাতে দিলুম। প্রথম পাতায় চোখ রেখে বললেন, লেখা কেমন হয়েছে জানি না, তবে হাতের লেখাটা বেশ ভালোই বাগিয়েছ। তোমার লেখা। আজই আমি পড়ে ফেলব, কাল তুমি খবর নিও।'

প্রায় এক লাফে রাস্তায়। আরও দশ-বিশ জায়গায় যাওয়ার ছিল। সব ঘুরে, ব্যাগ খালি করে পার্কে এসে একটা গাছতলায় আরাম করে বসলুম। হাত-পা ছড়িয়ে। বইয়েয় কম ওজন! সত্যদার সব বই বিক্রি করে দিয়েছি। আজ আমার দিন খুব ভালো। একটু দূরে আর একটা গাছের তলায় বসে একজন শিল্পী ছবি আঁকছিলেন। বেশ লাগছিল দেখতে। রঙে রঙে মিশে মিশে কি সুন্দর হচ্ছে! গাছ, সবুজ জমি, বসার আসন। দুটি লোক। সুন্দর পৃথিবী ছবিতে আরো কত সুন্দর হয়ে হঠে। আমি যদি শিল্পী হতুম, প্রথমেই তৃষার একটা ছবি আঁকতুম। পরের দিন আর সুদর্শন বাবুর কাছে যাওয়া হলো না। তার পরের

দিন গেলুম। গম্ভীর মুখে সুদর্শনবাবু বললেন, 'বসো।'

তাঁর মুখ দেখে ভয় পেয়ে গেলুম। ভীষণ রেগে গেছেন নিশ্চয়।

হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে টেবিল পেরিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমার ডান কানটা কষকষে করে ধরে বললেন, 'এঁচড়ে পাকা! গল্প লিখেছে। গল্প!'

লজ্জায় অপমানে জল এসে গেল আমার চোখে।

সুদর্শনবাবু বললেন, 'ওঠো। উঠে দাঁড়াও। বসে আছ কি বলে?'

আমি উঠে দাঁড়ানো মাত্রই তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। উত্তেজনায় তাঁর বুক হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে। সুদর্শনবাবু আবেগ জড়ানো গলায় বললেন, 'কি গল্প লিখেছিস তুই! কি সাংঘাতিক গল্প!

কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললেন, 'তোর হবে। তোর সাংঘাতিক হবে। তবে একটা কথা, মাথাটা ঠিক রাখিস। দীন-হীনের মতো সাহিত্যের সেবা করে যা। কেউ তোকে আটকাতে পারবে না।'

আমার চোখ বেয়ে জল নামতে লাগল হু হু করে। মনে পড়ে গেল বাবার কথা—সাফল্যের চেয়ে আনন্দের কিছু নেই। লক্ষ টাকা পেলেও ওই আনন্দ পাবে না। আমি সুদর্শনবাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলুম। মনে হলো আমার বাবাকেই প্রণাম করছি। মনে হলো, আমার জীবনটা ভরে গেল কানায় কানায়।

সুদর্শনবাবু চেয়ারে বসে বললেন, 'গল্পটা পরের সংখ্যাতেই যাচ্ছে। আমার দেওয়া নামেই যাবে, জ্ঞানদাস।'

আমার হঠাৎ খুব ভয় এল মনে, 'একটা তো লিখে ফেলেছি কোনও রকমে, আর যদি না পারি?'

'খুব পারবে জ্ঞানদাস, খুব পারবে। জীবনে একটা স্থায়ী দুঃখ, খুব সাবধানে, নিজের সন্তানের মতো প্রতিপালন করো, জীবনে বঞ্চিত হও, নিঃসঙ্গতাকেই সঙ্গী করো, নিজেই নিজের হাত ধরো। শিল্পী মাত্রেই একা। একেবারে একা। সেইটাই সমস্ত সৃষ্টির উৎস। ঈশ্বরকে বলো, সুখ আর শান্তি আমি চাই না। প্রভু, যত পারো আমাকে ব্যথা আর বেদনা দাও। শিল্প একটা ব্রতের মতো। সেই ব্রত ধারণ করো।'

'আপনি যে আমাকে ভালোবাসেন ?'

'মূর্খ! কেউ তোমাকে ভালোবাসবে, কেউ তোমাকে ভীষণ ঘৃণা করবে। সবই তোমার জীবনের পাওনা। মানুষের দুটো পা। একটা সুখ, একটা দুঃখ। একটা ঘৃণা, একটা ভালোবাসা। একটা মান, একটা অপমান। একটা ঠিক, একটা বেঠিক। জীবনকে দেখ। জীবন দিয়ে লেখো।'

চারটে বড় বড় সন্দেশ খেয়ে নেমে এলুম পথে। বেশ বুঝতে পারলুম, আমার বাবা, আমার ভেতরে বসে কাজ করছেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বংশের মুখ উজ্জ্বল হোক। ফেরার পথে সংকল্প করলুম—কারোকে বলব না। না সত্যদাকে না তৃষাকে। জ্ঞানদাস ছদ্মনাম। কেউ জানতেও পারবে না।

গল্পটা বেরলো। সম্পাদকমহাশয় নাম রেখেছিলেন, 'লাট্টু'। লেখক জ্ঞানদাস। প্রথম সারির সমস্ত লেখক স্বাগত জানালেন নবাগত লেখককে। অন্যান্য পত্রপত্রিকায় প্রশংসা বেরলো। সুদর্শনবাবু বললেন, 'ছদ্মনামের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকো। কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। আর একটা গল্প লেখো। তারপরেই হাত দাও উপন্যাসে। এবারের পুজোসংখ্যায় তোমার উপন্যাস আমি ছাপবো। যে জীবন তুমি দেখেছ, সেই জীবনের কথাই তুমি লিখবে। তবেই বিশ্বাসযোগ্য হবে। জীবনের কাছে থাকবে। জীবনের ভেতরে থাকবে। জীবনের বাইরে নয়। তাহলেই হয়ে যাবে গ্রহান্তরের মানুষ। লেখা তোমার মহাশূন্যে ঘুরপাক খাবে, জমি পাবে না।'

আমার দ্বিতীয় গল্পের নাম হলো 'ঘুরপাক'। সে আমার নিজেরই জীবন। একটা ছেলে জীবনের চাকায় ঘুরছে। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা। একটা সময়ে সে মেনেই নিচ্ছে, পেয়ে হারানো, হারিয়ে পাওয়া, এই হলো জীবনের খেলা। স্থায়ী কিছুই নয়। পিছল জমিতে দাঁড়িয়ে থাকার কসরত।

দ্বিতীয় গল্পটা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। সুদর্শনবাবু বললেন, 'নাঃ, তোমার হবে। অনেকেই কোনওরকমে একটা লিখে ফেলেন, তারপর ধীরে ধীরে তলিয়ে যান। সাহিত্যও এক ধরনের সাঁতার। জীবনসমুদ্রে ঢেউয়ের দোলায় দোল খাওয়া। এইবারে একটু একটু করে রসিয়ে রসিয়ে উপন্যাসটা লিখে ফেল। বেশ জমিয়ে।'

মাধ্যমিকের ফল বেরলো। সময়টা আমার ভালোই যাচ্ছে। আশাতীত ফল হলো, বিশুকে অবশ্য ধরতে পারলুম না। বিশু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল। আমি গোটাকতক লেটার পেলুম। মা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। মায়ের চোখে জল। বললেন, 'সেই পারলি, কেবল দুটো মানুষ হারিয়ে গেলেন। থাকলে কত আনন্দ হতো?'

তৃষা বললে, 'তাঁরা ওপর থেকে দেখছেন ঠিকই।'

মা বললেন, 'এইবার তোমার পালা। তোমাকে ঘিরেও আমার অনেক আশা।'

সত্যদা বললেন, 'তুমি নামী কলেজে ভর্তি হতে পারো; কিন্তু আমার মতে মধ্যবিত্ত কলেজেই ভর্তি হও। আর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কাজ নেই। তোমার পথ অধ্যাপনার পথ।'

মনে মনে ভাবলুম, সত্যদা ধরেছেন ঠিক। অধ্যাপক হলে লেখালেখির খুব সুবিধে হবে। আমি একটা প্রাচীন মধ্যবিত্ত কলেজে ভর্তি হলুম। আর কলেজে প্রথম দিন গিয়েই শুনলুম, ছেলেরা জ্ঞানদাসের লেখা নিয়ে আলোচনা করছে। তর্কবিতর্ক হচ্ছে। আমি যেন কিছুই জানি না। চুপচাপ শুনে গেলুম। আর শুনতে শুনতে অদ্ভুত একটা ব্যাপার হলো। আমি দু'খণ্ড হয়ে গেলুম। একখণ্ডে আমি লেখক। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি এক ছাত্র। একজন খুব প্রাচীন, আর একজন তরুণ। কেউ কারোকে চেনে না। কে জ্ঞানদাস! প্রশংসা শুনে আমার সামান্যতম পুলকও হচ্ছে না। সকলেই ধরে নিয়েছে জ্ঞানদাস কোনও প্রবীণ লেখকের ছদ্মনাম। দীর্ঘ সাধনার পর হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছেন। পেছনে একটা দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি আছে।

সত্যদাও আমাকে বললেন, 'হঠাৎ এক নতুন লেখক এসেছেন। সময় পেলে লেখা দুটো পড়ে নিও। নিছক গল্প নয়। ভাবায়। তোমার পড়া উচিত।'

হঠাৎ আমার মায়ের মাথায় একটা উদ্ভট চিন্তা ঢুকলো। চিন্তার উৎস একটা স্বপ্ন। বাবা মাকে ডাকছেন। ভোরের স্বপ্ন। একা আমার আর ভালো লাগছে না। তুমি চলে এসো। মায়ের কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, আমি আর বাঁচবো না। ডাক এসে গেছে। যাওয়ার আগে ছেলের বিয়ে দিয়ে যাব।

'মা স্বপ্ন কখনও সত্য হয় না। কারোর জীবনে হয়নি। ভাবনাটাই

স্বপ্ন হয়ে আসে। এত তাড়াতাড়ি তুমি যেতে পারো না। যাবেও না।'

'স্বপ্ন কখনও মিথ্যে হয় না পিন্টু। ভোরের স্বপ্ন।'

'আজকাল কলেজে পড়তে পড়তে কেউ বিয়ে করে না মা। আমার সহপাঠীরা আমার গায়ে থুথু দেবে। লোকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তারপর বিয়ে করে।'

'তোমার সারা জীবনের ব্যবস্থা তো তোমার বাবা করে রেখে গেছেন। সেদিক থেকে তুমি তো ভাগ্যবান বাবা।'

'কোনও মেয়ের বাবা আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। ও সব সেকালে হতো।'

'সে ভাবনা তোমার নয় আমার। মেয়ে আমার কথা দেওয়া আছে।'

'তার মানে ?'

'মানে, আমার ছেলেবেলার এক বন্ধুর মেয়েকে কথা দেওয়া আছে।'

'সেটা ভেঙে দিতে হবে মা। মনে করো, আমায় বিয়ে হয়েই গেছে।'

'তার মানে ?'

'তোমার পুত্রবধূ ও ঘরে বসে লেখাপড়া করছে এখন। আজ থেকে পাঁচ বছর পরে সে তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে তোমার ছেলের বউ হয়ে।'

মা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে বললেন, 'অসম্ভব। তৃষা তোমার বোন। ওকে আমি মেয়ে হিসেবে মানুষ করছি।'

'ছেলের বউও মেয়ে। সে-ও তোমাকে মা-ই বলবে।'

'সেই মা আর এই মায়ে অনেক তফাৎ। দুটো দু'রকমের মা।'

'মা কখনও দু'রকমের হয় না। মা বললে একজনকেই বোঝায় আর তিনি মা।'

'কথার মার প্যাঁচ করার চেষ্টা কোরো না। তৃষা আর তুমি ভাইবোন।'

'তুমি জোর করে একটা সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করলে কি হবে। আমাদের নিজেদের একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে আছে।'

'এত দূর ? তা হলে তৃষার তো আর এ বাড়িতে থাকা হয় না।'

'কেন হয় না ?'

'ও যদি তোমার বউই হবে, তাহলে বিয়ের একটা প্রশ্ন আসছে। বিয়ে না করা পর্যন্ত সে তো বউ নয়। বিয়ের কনে আলাদা বাড়িতেই

থাকবে।'

'এই তো বলছিলে তুমি আমার বিয়ে দেবে!'

'তোমার এখনও বিয়ের বয়স হয়নি।'

'ও তোমার ঠিক করা পাত্রীকে বিয়ে করলে বিয়ের বয়স হয়েছে, আর তৃষাকে বিয়ে করলে বয়স হয়নি। তোমার কোনও তুলনা হয় না মা। তুমি অদ্বিতীয়। তোমার অদ্ভুত অদ্ভুত সব যুক্তির জন্যই তোমার সংসার আজ শূন্য। তোমার জন্যেই আমাকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। জ্যাঠামশাই আমাকে আদরে আদরে বাঁদর করেছেন, এ কথা তুমি প্রায়ই বলতে। আর সেই কারণেই জ্যাঠামশাই আমাকে খুঁজতে ছুটেছিলেন হাসপাতালে হাসপাতালে। যখন কোথাও পেলেন না, তখন তোমার ভয়ে নিজেকে গাড়ির তলায় ফেলে দিলেন।'

'কে বলেছে? কে বলেছে এ-কথা? তার মানে আমি খুনী?'

'তুমি আমাকে খুনী বলেছিলে। রেগে আমাকে গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিলে। সেই কাটা দাগ এখনও আমার কপালে। তুমি জানতে জ্যাঠামশাইকে তুমি কি বলেছিলে? আর জানতে বলেই তোমার অত রাগ হয়েছিল। তুমি আমার বাবাকেও উদ্ব্যস্ত করে মেরেছ। তুমি সব জানো, সব বোঝো, তবু তোমার বিশ্রী জেদ, তোমার আমির অহঙ্কার গেল না। দুটো মৃত্যুকে তুমি যত ভুলছ, তোমার পুরনো স্বভাব ততই জেগে উঠছে।'

মা উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়ালেন। তৃষা ঘরে এসে বললে, 'আমাকে নিয়ে যখন অশান্তি, তখন আমি চলেই যাবো।'

মা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কারোকে যেতে হবে না, আমিই যাবো।'

'কোথায় যাবে তুমি? তোমার যাবার কোনও জায়গা আছে?'

'বিধবা বুড়িরা চিরকাল যেখানে যায় ঘর-ছাড়া হয়ে আমি সেখানেই যাবো।'

'এই শরীরে?'

'না হয় মরবো।'

'আর তোমার এই সম্পত্তি আমরা যক্ষের মতো আগলাবো; আর সারা জীবন লোকে আঙুল দিয়ে দেখাবে, ওই দেখ মাকে তাড়িয়েছে।'

আমার সেই গল্পটা মনে পড়ল—একটি লোক মৃত্যুর সময় বলে

গিয়েছিল, দ্যাখো, আমি তো খুব খারাপ লোক ছিলুম, তা আমি এখন মরছি। মরার পর আমাকে তোমরা পেছনে বাঁশের গোঁজা দিয়ে হাটের কাছে প্রদর্শনী করে রেখ, খারাপ লোকের শাস্তি। গ্রামবাসীরা তাই করল; আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কোতোয়ালি থেকে রাজকর্মচারীরা গ্রামকে গ্রাম ধরে নিয়ে গেল খুনের দায়ে। আমার মাকে এই গল্পটা শোনাতে ইচ্ছে করছিল। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অসম্মান করে ফেলেছি। মায়ের মুখ থম মেরে আছে। বড় করুণ সে মুখচ্ছবি। বড় অসহায় মহিলা। পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। নিজের গোঁ আর জিদ ছাড়া।

মা বললেন, ‘একটা কথা তুমি শুনে রাখো, তৃষাকে বিয়ে করে তুমি কোনওদিন সুখী হতে পারবে না। কেন জানো? তৃষার ওই সর্বনাশা রূপ। ও হলো নায়িকা। কিন্নরী। সেকালে এইরকম মেয়েকে দেবদাসী করা হতো।’

‘একালে এইরকম মেয়েরা চিত্রাভিনেত্রী হয়। সুখেই ঘরসংসার করে।’

‘করতে পারে, তবে এক স্বামীর সঙ্গে নয়। দ্রৌপদীর মতো পঞ্চস্বামীর সঙ্গে।’

‘তাহলে তোমার মতে তৃষার কি ব্যবস্থা করা উচিত?’

‘ছেলের বউ না করাই উচিত।’

তৃষা বললে, ‘এই মুহূর্তেই আমি চলে যাবো।’

স্মরণ করিয়ে দিলুম, ‘তৃষা, আজ বাদে কাল তোমার পরীক্ষা। তুমি কোথায় যাবে? কোথায় গিয়ে উঠবে তুমি! তোমার দাদা হাসপাতালে। দোকান চালাচ্ছে তোমার দাদার বন্ধু। নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে?’

‘ভবিষ্যৎ তোমরাই তৈরি করছিলে। আমার আবার ভবিষ্যৎ কি! আমি তো পথের মেয়ে। পথ থেকে এসেছিলুম, আবার আমি পথেই ফিরে যাবো।’

তৃষা কাঁদতে লাগল।

মা বললেন, ‘তোমাকে আমি একবারও চলে যেতে বলিনি।’

‘তার চেয়েও বেশি বলেছ তুমি। বলেছ চরিত্রহীন।’

‘তোমরাই প্যাঁচ করে বাঁকা মানে করছ। আমার মা আমাকে যা

বলতেন, আমি তোমাদের তাই বলেছি। এতে তৃষা যদি রাগ করে চলে যেতে চায় তো যাক। তোমাদের দু'জনেরই এই বয়েসটা সুবিধের নয়। ঘি আর আগুন পাশাপাশি না থাকাই ভালো।'

'তুমি একটা ভুল করছ মা। আমি মার খাওয়া ছেলে, তৃষা গরিবের মেয়ে। যে-সব মেয়ে উড়ে বেড়ায় তারা সব পয়সাঅলার ঘরের। চরিত্র খোয়াতে হলে টাকা চাই মা। ট্যাঁকের জোর থাকা চাই।'

তৃষা পড়ার ঘরে চলে এল। বইপত্র মুড়ে বসে রইল করুণ মুখে। আমি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইলুম। পৃথিবী যেমন চলছিল সেই-রকমই চলছে। আমাদের ভেতরে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেলেও বাইরেটা ঠিকই আছে। দোকানপাট, কেনাবেচা, লোকজন, হইহল্লা, হাসিঠাট্টা। আবার আমার ভাঙনের দিন এল। ঘর ছেড়ে ভেসে যাবার দিন। জোতিষী ঠিকই বলেছিলেন, দেখ বাপু তোমার কোষ্ঠীতে গৃহসুখ নেই। তুমি সব পাবে, যশ, খ্যাতি, সম্মান, অর্থ, কিন্তু সারাটা জীবন তোমাকে জ্বলতে হবে।

বেশ, তাই হোক। তৃষাকে বললুম, 'চলো।'

'কোথায় ?'

'যেখানে তোমাকে আমি নিয়ে যাবো। আমার ওপর তোমার বিশ্বাস এখনও আছে তো ? না, নষ্ট হয়ে গেছে ?'

'আছে।'

'তাহলে চলো। যে অবস্থায় আছো সেই অবস্থায়। শুধু তোমার বই আর খাতাপত্তর নেবে।'

'মাকে ছেড়ে আমি যেতে পারবো না। কিছুতেই পারবো না। মা বড় একা। ভীষণ অসহায়।'

'তাহলে তখন বললে কেন ?'

'না ভেবেই বলেছিলাম। হঠাৎ। তোমার চেয়েও আমি মাকে বেশি ভালোবাসি।'

তৃষা কেঁদে ফেলল। চোখ মুছে বললে, 'মাকে কার কাছে রেখে যাবো ? আমার তো মনে হয়, স্বামী স্ত্রী হওয়ার চেয়ে, ভাইবোন হওয়া অনেক ভাল। তাহলে আমরা দু'জনেই মাকে পাবো। মাকে বাদ দিয়ে কোনও কিছুই ভাবা যায় না, ভাবা উচিত নয়। তুমি একবার ভেবে দেখ। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো।'

অবাক হয়ে তৃষার দিকে তাকিয়ে রইলুম। আমার নিজের মাকে তো আমি এইভাবে ভালোবাসতে পারিনি কোনও দিন। ভীষণ লজ্জা হলো নিজের ওপর। মেয়েরা কত সহজে গুটিয়ে নিতে পারে নিজেকে? প্রেম, ভালোবাসা, বিয়ে, কত কি ভেবে বসে আছি আমি! তৃষাকে অন্য কেউ বিয়ে করবে ভাবলে মনে হতো, হয় আমি তাকে খুন করব, না হয় আত্মহত্যা করব নিজে। কোনও দিনই তৃষাকে আমি বোন হিসেবে ভাবতে পারবো না। তৃষা আমার প্রথম প্রেম।

সত্যদার কাছে গিয়ে আমার বইয়ের ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিলুম। সত্যদার হাঁটুতে কি হয়েছে হাঁটতে পারছেন না। আমাকে বলেছেন—ঈশ্বরের আদেশ, সিট ডাউন, আর গেট আপ বলবেন কিনা জানি না। তুমি বেশ ভালোই করছ, তোমার ব্যবসা তুমি বুঝে নাও। এবার আমার ছুটি।

ঝোলাটা নিয়ে বেরোচ্ছি, সত্যদা বললেন, 'আজ তোমাকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে কেন?'

'পরে বলবো সত্যদা। আগে নিত্য টহলটা মেরে আসি।'

রাস্তায় বেরিয়ে জনসমুদ্রে মিশে গেলে নিজের সব কিছু বেশ হারিয়ে যায়। অনেকের মধ্যে আমি এক। ফেরিঅলার জীবিকাটা বেশ ভালো। দিনের শেষে সেই পার্কে এসে বসলুম। সেই গাছের তলায়। সারা দিনের খাদ্য এক টাকার বাদাম। মুখ চলছে, চলছে ভাবনা। তৃষাকে মনে পড়লেই ভেতরে এক হাজার তৃষ্ণার্ত দাঁড়কাক যেন খা খা করে ডাকছে। কেন মানুষ আত্মহত্যা করে বুঝতে পারছি। মানুষ মানুষের জন্যেই মরে। পুকুরের শান্ত জলে ঢিল ছোঁড়ার মতো শান্তিতে অশান্তির ঢেউ তোলে। তাইতেই আনন্দ। বিষম, বিপুল অহঙ্কার হলো মানুষের আমি। আমির উৎপাত পাগলা হাতির উৎপাতকেও ছাড়িয়ে যায়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তৃষার জন্যে অপেক্ষা করব। হঠাৎ এমন একটা বিশ্রী চিন্তা এল, নিজেই চমকে উঠলুম—মা যদি হঠাৎ মারা যান তাহলে কার কি ক্ষতি হয়! ভালোই তো হয়। মহিলার অশান্তি ছাড়া আর কি-ই বা করার আছে। এখনও এই অবস্থায় সংসারটাকে কত সুন্দর করা যায়! পারবেন না তিনি। মা পুড়তে আর পোড়াতে ভালোবাসেন। এও এক ধরনের বেঁচে থেকে আত্মহত্যা।

চিন্তাটাকে মন থেকে ধাক্কা মেরে সরালুম। যে ছেলে মায়ের মৃত্যু চিন্তা করে, সে তো পাপী। তার জীবনে তো ভালো কিছু হতে পারে না। এইরকম একটা কালো মন আমার ভেতরে আশ্রয় করে আছে! আর আমি জামা-কাপড় পরে সেজেগুজে ঘুরে বেড়াচ্ছি! কিছু না ভেবে বসে রইলুম বেশ কিছুক্ষণ। সন্ধ্যা নামছে ইস্পাত কালো ডানা মেলে। হঠাৎ ভেতরে একটা আলোর ঝিলিক খেলে গেল। এই তো আমার উপন্যাসের বিষয়! সুদর্শনবাবু বলেছিলেন, জীবন দিয়ে লিখবে। এই তো সেই লেখা। শেষটা আমার জানা নাই, কিন্তু শেষটা আমি তৈরি করতে পারি। প্রথমটা হবে জীবনের মতো লেখা। জীবনের সঙ্গে লেখাকে মেলাবো, পরেরটা হবে লেখার মতো জীবন। লেখার সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেব। পরে জীবন যখন সময়ের সেই পথ ধরে হাঁটবে মিলিয়ে মিলিয়ে নেবে। সত্যদা বলেন, ঘটনা সব ঘটেই আছে, তুমি শুধু হেঁটে যাও।

উপন্যাস হয়ে ওঠার আনন্দে আমার সব দুঃখ হারিয়ে গেল। রাতে সত্যদা যখন জিজ্ঞেস করলেন—'তোমাকে মেঘলা দেখছি কেন সকাল থেকে?'

হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'উপন্যাস।'

'উপন্যাস মানে?'

বিপদে পড়ে গেলুম। সত্যদা তো জানেন না, আমি জ্ঞানদাস। সে কথা প্রকাশ না করে বললুম—'সত্যদা আমি আমার জীবন দিয়ে একটা উপন্যাস লেখার চেষ্টা করছি।'

'তোমার জীবন তো এখনও শুরুই হয়নি।'

'ভেতরে ভেতরে অনেকটা এগিয়ে গেছে সত্যদা।'

'তার মানে তুমি বাঁচার চেয়েও বেশি বেঁচে আছ? দেখতে পাচ্ছ নিজের চলার পথ?'

'পাচ্ছি সত্যদা।'

'বাঃ, অঙ্কে তাহলে তোমার মাথা খুলে গেছে। জীবন এক জটিল অঙ্ক। যাদের ভালো মাথা তারা দু'তিন ধাপ এগোবার পরই উত্তরটা দেখতে পায়। হাতে এক থাকবে কি শূন্য। সাধকের হাতে থাকে এক, সাধারণের হাতে শূন্য।'

একবার মনে হয়েছিল বাড়ি ছেড়ে সত্যদার কাছেই থাকি এসে। দুটো

কারণে তা আর করা হলো না। প্রথম কারণ, সত্যদার একটাই মাত্র ঘর। অর্ধেক বইয়ে ঠাসা। জায়গা নেই বললেই হবে। একটা মানুষ শুতে পারে কোনও রকমে। দ্বিতীয় কারণ, আমি বাড়ি ছাড়া হলে তৃষাও চলে যেতে পারে। তৃষা এখন উঠতি বয়সের ছেলেদের নজরে আছে। সুযোগ পেলেই হাত ধরে টানবে। যা কবার করে ভাসিয়ে দেবে জলে! কোনও রকমে আর পাঁচটা বছর আমাকে মাথা নিচু করে থাকতে হবে। থাকতে হবে গা বাঁচিয়ে, কায়দা করে। তারপর আমি ভাববো, কি করতে পারি আর কি না পারি। ততদিনে আমার ছাত্রজীবন শেষ হয়ে যাবে।

শুরু হলো আমার উপন্যাস। এক মা, তার একমাত্র ছেলে। বেশ বড মাপের একটা বাড়ি। অনেক ঘর। সবই প্রায় তালাবন্ধ। একটা ঘরে লাইব্রেরি। আইনের বই র‍্যাকে র‍্যাকে। মাঝখানে সেগুন কাঠের বিলিতি কায়দার টেবিল। বিশাল একটা চেয়ার। দেয়ালে চোখা চেহারার দুই মানুষের ছবি। মুখে সুখী সুখী ভাব। এঁরা দুই ভাই। আর এক দেয়ালে ভীষণ রাশভারি এক মানুষের প্রমাণ মাপের অয়েল পেন্টিং। এই পরিবারের বড় কর্তা। যে যার কর্মফল শেষ করে অমর্ত্যধামের যাত্রী। একটি মেয়ে অসাধারণ সুন্দরী। গোলাপী ফ্রক পরে যখন ঘুরে বেড়ায়, মনে হয় স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। ছেলেটি মেয়েটিকে ভালোবাসে, মেয়েটিও ছেলেটিকে ভালোবাসে। একদিন তারা চুক্তি করেছিল, বড় হয়ে বিয়ে করবে।

সাদা নরুন পাড় শাড়ি পরে যে ভদ্রমহিলা তারে শাড়ি মেলছেন, তিনি জীবনে হেসেছেন খুবই কম। যতদিন স্বামী বেঁচেছিলেন, ততদিন শুধু গেল গেল করেছেন, আর করেছেন, হলো না, হলো না। সমস্ত মানুষের জীবনকে তিনি আতঙ্কে রেখেছিলেন। সেই সব আতঙ্কিত মানুষরা টপাটপ মরে গিয়ে পরম শান্তি পেয়েছেন। এই যে মহিলা শাড়ি মেলছেন, তিনি এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখী মহিলা কারণ তিনি নিজের মত ছাড়া, পৃথিবীতে আর কারোর মত স্বীকার করেন না। নিজের মন ছাড়া, আর কারোর মনকে মন বলে মনেই করেন না। তিনি সব সময় সোজা পথ ছেড়ে, জটিল পথের চলাতেই অভ্যস্ত। সব ব্যাপারে নিজের মত খাটাতে গিয়ে এখন একেবারে নিঃসঙ্গ। মেয়েটি তাঁর নিজের মেয়ে নয়; কিন্তু মেয়ের মতো করে মানুষ করছেন। মেয়েটি অসহায়। অনাথই বলা যায়। এক দাদা ছাড়া তার আর কেউ

নেই। সেই দাদাও এখন হাসপাতালে। তার নানা অসুখ। একটা তেলে-ভাজার দোকান দিয়ে বেশ ভালোই চালাচ্ছিল। এখন তার ভবিষ্যৎ ভাগ্যের হাতে। মেয়েটি ওই মহিলাকে ধরে ধরে খুব সাবধানে ঠাকুর-ঘরের দিকে নিয়ে চলেছে। কারণ সাঙ্ঘাতিক বাতে ভদ্রমহিলা প্রায় পঙ্গু। মেয়েটি এই মহিলাকে মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। মেয়েটিকে মহিলা প্রায় গ্রাস করে ফেলেছেন। মেয়েটি শৈশবেই অনাথ। মায়ের স্নেহের কাঙাল। তার ফলেই এত সহজ হয়েছে ব্যাপারটা। মহিলা মা হবেন, শাশুড়ী হতে ঘোরতর আপত্তি। মেয়েটি ছেলেটির বোন হয়ে থাকতে চায়, বউ হতে আর রাজি নয়। যত তার বয়েস বাড়ছে, ততই তার মনের পরিবর্তন হচ্ছে। ছেলেটি এখন সর্ব অর্থে অসহায়। মায়ের সঙ্গে তার বাক্যালাপ বন্ধ। মেয়েটির কাছ থেকে সে পালিয়ে বেড়ায়। যখনই ভাবে মেয়েটি আর কারোর বউ হবে, ছেলেটির বুক ফেটে যায়। ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে।

প্রতিদিন গভীর রাতে এই বিচিত্র জীবনকাহিনী তিন-চার পাতা করে এগোতে লাগল। ঘন্টা চারেক চেপে লেখাপড়া করি, ঘন্টা তিনেক চুটিয়ে লিখি। আমাদের বাড়ির তিনতলার ছাদের সেই নির্জন ঘর। যে-ঘরে বাবার বকুনি খেয়ে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতুম, আর জ্যাঠামশাই চুপিচুপি এসে আমার মাথায় হাত রেখে বলতেন, বাপি খাবে চলো। বাপ, মা, গুরুজনেরা ছেলেদের একটু বকেই থাকেন। লিখতে লিখতে দেখতুম পশ্চিম আকাশে তারামন্ডল ঢলে পড়ছে। শেষ রাতের চাঁদ অসুস্থ মেয়েটির মতো ক্রমশই ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। বাতাস চরিত্র পরিবর্তন করে ভোরের শীতল আমেজ মাখছে। প্যাঁচারা প্রাণখুলে ডেকে রাতকে বিদায় জানাচ্ছে। বিশু থাকলে পড়ে শোনাতুম। সে চলে গেছে রুরকিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। লিখতে লিখতে ভাবি তৃষা হয়তো আসবে। এসে বলবে, রাত ভোর হয়ে এল, এবার শুয়ে পড়ো। আসে না। হয়তো মায়ের ভয়ে, নয়তো সে আর আমাকে ভালোবাসে না। ভালোবাসা বড় ঠুনকো। ভীষণ ক্ষণিক। ভোরের শিশিরের মতো। রোদ উঠলেই বাষ্প হয়ে যায়। স্বার্থ হলো সেই রোদ।

এই কাহিনী আমারই কাহিনী। আমারই পথ চলা। আমি, নিজেকে বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট করে দিলুম ইতিহাসে। তৃষাকে ঢুকিয়ে দিলুম ভালো একটা কলেজে। আর এক গুরু এনে মাকে দিয়ে দিলুম

দীক্ষা। মাকে চালিয়ে দিলুম ধর্মের পথে। সেইটাই হওয়া উচিত—যার কেহ নাই তুমি আছ তার। বাড়িতে বয়ে গেল ধর্মকর্মের জোয়ার। সত্যদার বয়েস আরও বাড়ল। পরের জন্যে বাঁচতে গিয়ে মানুষটির নিজের বলে আর রইল না কিছু। ঘরের দেয়ালে নোনা ধরেছে। গাদাগাদা বইয়ের ওপর ঝুরঝুর শব্দে দেয়াল ঝরে পড়ে সারা রাত। ওই হলো সময়। বালির ঘড়ি হয়ে ঝরছে। তারই মাঝে রাজার মতো বসে আছেন সত্যদা। কেবল বলছেন, দিন ছোট হয়ে আসছে, পড়োনি, আর একটু পড়োনি। বৃষ্টি এলে, ছাতা ধরেন উনুনে বসানো ভাতের হাঁড়ির মাথায়। থেকে থেকেই বলেন, দুঃখে যে হাসতে পারে সেই ধার্মিক। ছাত্ররা সারাদিন তাঁকে ঘিরে থাকে। তিনি বলেন, এরাই আমার বাহিনী। আমাদের লড়াই অজ্ঞানের বিরুদ্ধে, অশিক্ষার বিরুদ্ধে। জ্ঞানই আমাদের ধর্ম।

পনেরো দিনে আমার উপন্যাসের চরিত্ররা অনেকেই অনেক দূর এগিয়ে গেল। লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে নিজেকে বিধাতা বলেই মনে হয়। ঘটনার পর ঘটনা তৈরি করেছি, যেমন তিনি করেন। এই কাহিনীতে নিজের নাম রেখেছি মানব। মানবকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিয়েছি। একই বিভাগে পড়ে এষা। খুব শান্ত। ধীর। দীর্ঘ ছিপছিপে শরীর। কবিতার মতো। ধারালো মুখ। খাড়া নাক। অসম্ভব বড় বড় দুটো চোখ। যখন তাকায় মনে হয় আকাশে তাকিয়ে আছে। এষা আর তৃষা, শেষ উচ্চারণে একই রকম শোনায়। এষার দিকে তাকালে মানবের কবিতা আসে মনে। মনে হয় বহু পথ ধরে দুই পথিক হাঁটতে হাঁটতে আসছে, বহু অভিজ্ঞতা গায়ে মেখে। মানব তো আমিই। আমার মনও তো ঘুরছে। এক থেকে অন্যে। যে আগুনে ভাত রান্না হয়, সেই আগুনেই তো ডাল হয়, তরকারি হয়। জীবনের ঘটনাকে উপন্যাসে ঢুকিয়ে দিলুম। সেদিন কলকাতা ভেসে গেল বৃষ্টিতে। জলজমা সন্ধ্যার কলকাতার পথে গোলাপী ধোঁয়ার আঁচল উড়ছে। সব অচল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিপরীত ফুটপাথে এষা দাঁড়িয়ে, অদূরে মানব। হঠাৎ এষা জিজ্ঞেস করলো, 'আজ কি করে ফিরবো ?'

মানব বললে, 'আমিও ঠিক ওই একই কথা তখন থেকে ভাবছি, তুমি কি করে ফিরবে ?'

'তুমি আমার কথা ভাবছ ? নিজের কথা ভাবছ না ?'

'আমার গুরু নিজের কথা ভাবতে শেখাননি।'

'কে তোমার গুরু? কোন আশ্রমে থাকেন?'

'কোনও আশ্রম নয়। ভুবন দত্ত লেনের নোনাধরা একটা ঘরে।'

'সেটা কোথায়?'

'উত্তর কলকাতায়, আমার পাড়ায়।'

'তাহলে তুমি এই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তুমি তো যাবে উত্তরে!'

'তোমার জন্যে। তুমি যেতে পারলে কিনা, নিশ্চিত হয়ে তবেই তো আমি যেতে পারি।'

এষা অনেকটা কাছে সরে এলো, 'মানব, তোমার সঙ্গে তো আমার তেমন পরিচয় নেই। আজই বোধহয় প্রথম এত কথা? তুমি আমার জন্যে এতটা ভাবো!'

'অনেকেই অনেকের জন্যে ভাবে। কখনও জানা যায়, কখনও জানা যায় না। আজ একটা জানাজানি হয়ে গেল।'

'আমার কাছে এ এক বিরাট আবিষ্কার।'

'এ আবিষ্কারে মানুষের কোনও উপকার হবে না।'

'আমার হবে। তোমার কথা আমিও মাঝে মাঝে ভেবেছি।'

'কেন?'

'পৃথিবীর প্রায় সব কেন-র জবাব আছে—দুটো কেন-র কোনও জবাব নেই। প্রথম কেন—মানুষ কেন আসে? দ্বিতীয় কেন—কেন একজন আরেকজনকে ভাবে?'

'চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কি ভাবে? সে যে অনেক দূর। হাঁটা তো যাবে না। আমি কি ভাবছি জানো, আমার বাবা অন্ধ। বাড়িতে একটা কাজের মেয়ে ছাড়া দ্বিতীয় কোনও প্রাণী নেই। তাই আমার ভেতরটা ছটফট করছে।'

'চলো, কিছুটা হেঁটে ধর্মতলা পর্যন্ত যাই। সেখান থেকে যা হয় একটা কিছু ধরা যাবে।'

'তোমার দূরত্ব যে বেড়ে যাবে। তারপর তুমি কি করে ফিরবে?'

'শোনো, তোমাকে ফেরাতে পারলে, তোমার ফেরার ভাবনাটা আমার মন থেকে নেমে যাবে, আমি তখন পাখির মতো হালকা। নির্ভার।'

মানব আর এষা হাঁটছে। থই থই জল। বিকল সব গাড়ি। ঠ্যাং তুলে দাঁড়িয়ে গেছে সার সার ট্রাম। মানব আর এষা একটা দোকানে মুখোমুখি বসে, দু'কাপ কফি খেয়ে নিল। পরিচয়টা হঠাৎ খুব ঘন হয়ে উঠল। সেই রাতটা মানবের কেটে গেল এষাদের বাড়িতে। এষার বাবা ছিলেন আর্মি অফিসার। যুদ্ধে চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে। এষার মা মারা গেছেন, এষা যখন খুব ছোট।

গভীর রাতে সেই ছাদের ঘরে বসে লিখতে লিখতে মনে হলো, এষা তো সত্যিই আছে; কিন্তু কবে আসবে সেই ঝড় জলের রাত। সত্যদা বলেছেন, জীবনের সব ঘটনা ঘটে আছে, আমরা সেইসব ঘটনার ভেতর দিয়ে চলতে থাকি। মহাপুরুষরা দেখতে পান, আমরা সাধারণ মানুষরা এক সময়ে বসে আগামী সময়ের কিছুই দেখতে পাই না। খালি চোখ আর দূরবীনে যা তফাত।

মানব এম. এ-তে ফাস্ট'ক্লাস ফাস্ট' হবে। মানব ডক্টরেট করবে। মানব অধ্যাপনার চাকরি পাবে। আর তৃষার সঙ্গে বিয়ে হবে ইঞ্জিনিয়ার বিশুর। এই জায়গায় এসে থমকে গেলুম। বিশুর সঙ্গে বিয়ে হবে কেন? কেন মনে হচ্ছে! বিশুকে আমি দেখেছি, এই বাড়িতে যখন আসত, তৃষার দিকে যেন তার নজর ছিল। বিশু ইঞ্জিনিয়ার হবে। অনেক বড় চাকরি করবে। গাড়ি হবে, বাড়ি হবে। বিশাল প্রতিপত্তি হবে তার। মধ্যবিত্ত জীবনের যত প্রচলিত বিশ্বাস ও আদর্শ সব তার কাছে হয়ে যাবে মৃত। বিশু বদলে যাবে। বিশু তৃষাকে চাইবে তার রূপের জন্যে। আর বিশুকে চাইবেন আমার মা।

একটা দৃশ্য ভেসে উঠল—কোথাও কোনও এক পাহাড়ী জায়গা। সাদা দুধের মতো একটা বাড়ি। সবুজ একটা লন। ঝকঝকে এক হুইল-চেয়ার, সাদা এক মাথা চুল, এক বৃদ্ধা। চোখে সোনালী চশমা। চেয়ার ঠেলে নিয়ে আসছে, দীর্ঘ, ধারালো, চেহারার এক তরুণী। নীল শাড়ি আঁচল বাতাসে উড়ছে, খাটো চুল দুলছে কাঁধের কাছে। কে? আমার মা, আর এষা। তার মানে, মানব এষাকে বিয়ে করেছে। বেড়াতে গেছে পাহাড়ে। সংসারে সুখ ফিরে এসেছে। প্রাচীনকালের মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যবিত্ত সুখ।

সত্যদা বললেন, শেষটা বদলাও। ওটা তোমার জীবনের ঘটনা নয়। তোমার জীবন চলে যাবে পাশ ঘেঁষে। তোমার আর আমার

জীবন এক সুরে বাঁধা। আমাদের সব থেকেও কিছু থাকবে না। আমার এই নোনাধরা মসনদের তুমিই উত্তরাধিকারী। সংসার আমাদের দয়া করে ক্ষমা করেছে। তাই অসুখী হয়েও আমরা সুখী। আমরা জ্ঞানী-ভিখারী, ফেরিঅলা। আমরা শেষ মাইলপোস্ট যাবো অন্য পথে। অন্য ভাবে।

আমার উপন্যাস ছাপা হলো পুজো সংখ্যায়। সুদর্শনবাবু বললেন, পেরেছো জ্ঞানদাস। তুমি পেরেছো। সত্যদা বললেন, দায়িত্ব বাড়ল। যতটা এসেছ, এসেছ, বাকিটার সঙ্গে জীবন মেলাও। কাঁটায় কাঁটায়।